POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ؕ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ

এবং তোমার জাতি ইহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, অথচ ইহাই সত্য; তুমি বল, ' আমি তোমাদের উপর কোন অভিভাবক নহি।'

(আল আনআম: ৬৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 30

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 28 শে জুলাই, 2022 28 জুল হজ্জ 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.)-এর মদিনার প্রতি ভালবাসা

১৮৮৫) হযরত আনাস (রা.) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন: হে আমার আল্লাহ্! মদিনায় দ্বিগুণ বরকত দান কর, তার থেকে যা তুমি মক্কাকে দান করেছ।

১৮৮৬) হযরত আনাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) যখন কোনও সফর থেকে ফিরে আসতেন আর মদিনার প্রাচীর দেখতে পেতেন, তখন তিনি মদিনার প্রতি ভালবাসার টানে নিজের উটকে দ্রুত হাঁকাতেন আর যদি অন্য কোন বাহনের উপর আরোহিত থাকতেন, তবে সেটিকেও দ্রুত হাঁকাতেন।

১৮৮৭) হযরত আনাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে বনু সালমা গোত্র নিজেদের বাসস্থান ত্যাগ করে মদিনার কাছাকাছি চলে আসতে মনস্থির করে। মদিনার কোনও দিকে শূন্যস্থান থাকুক, রসুলুল্লাহ্ (সা.) তা চাইতেন না। তিনি বললেন: হে বনু সালমা! তোমরা কি পাঁয়ে হাঁটার পুণ্য চাও না? একথা শুনে তারা সেখানেই থেকে যায়।

* হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ (রহ) বলেন: ওহদের পাদদেশে দুটি গোত্র বাস করত। বনু সালমা এবং বানু হারসা। তাদের এলাকার নাম ছিল যথাক্রমে দিয়ার বনী সালমা এবং দিয়ার বনি হারসা। বনু সালমা গোত্র ইয়াসরাবের কাছাকাছি আসতে চাইছিল যাতে নামাযে অংশগ্রহণ করতে সুবিধা হয়। কিন্তু নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে আঁ হযরত (সা.) তাদের নিজেদের বসতিতেই বাস করা পছন্দ করেন।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড,কিতাব ফাযায়েলুল মদীনা)

জুমআর খুতবা, ২৪ জুন
জুন ২০২২
ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান।
প্রশ্নোত্তর পর্ব

একজন মুত্তাকি কুঁড়ে ঘরে থেকেও সত্যিকার প্রশান্তি লাভ করতে পারে যা একজন বস্তুবাদি এবং লালসার দাস এক বিশালাকার দুর্গেও পায় না। তারা যতটা জাগতিক সুখ-সমৃদ্ধি পায় অনুরূপভাবে তারা অধিক বিপদাপদেরও সম্মুখীন হয়। অতএব, স্মরণ রেখো, প্রকৃত সুখ ও শান্তি বস্তুবাদির ভাগ্যে জোটে না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

চিন্তা করে দেখ যে মানুষ পৃথিবীতে এর থেকে বেশি আর কি চায়? পৃথিবীতে মানুষের সব থেকে বড় বাসনা হল সুখ-শান্তি লাভ করা। এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটিই পথ নির্ধারণ করে রেখেছেন যেটিকে তাকওয়ার পথ বলা হয়। ভিন্ন বাক্যে এটিকে কুরআন করীমের পথ বলা হয় কিম্বা আমরা সিরাতে মুস্তাকিম বলি।

কেউ আবার যেন এ বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্ত না হয় যে কাফেরদের কাছেও ধন-সম্পদ থাকে আর তারা ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবনযাপনে মত্ত থাকে। আমি তোমাদেরকে সত্যি সত্যি বলছি! তারা জগতের দৃষ্টিতে, বা বলতে পারি জঘন্য জড়বাদি ও প্রদর্শনকামীদের দৃষ্টিতে সুখী বলেই মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা এক মর্মযাতনা ও অন্তর্দহনে নিপতিত। তোমরা তাদের বাহ্যিক রূপ দেখেছ মাত্র, কিন্তু আমার দৃষ্টি তাদের হৃদয়ের প্রতি যাদেরকে আমি দেখতে পাই অগ্নিকুণ্ড, লৌহ-গলবন্ধ ও শেকলে আবদ্ধ। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন- اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۠ وَ اَغْلٰلًا وَّ سَعِيْرًا । (দাহার:৫)। তারা পুণ্যের দিকে আসতেই পারে না। তাদের গলায় খোদার পক্ষ থেকে এমন লোহার গলবন্ধ পরানো থাকে যার ভারে তারা অবদমিত থাকে যেভাবে পশুদেরকে শেকল পরানো হয়। তাই তারা খোদার দিকে অগ্রসর হতে পারে না। তাদের দৃষ্টি সব সময় জগতের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে আর তারা জগতের প্রতিই আসক্ত। কিন্তু তারা অন্তর্দহনেও নিপতিত। যদি ধন-সম্পদের ক্ষতি হয় অথবা আশানুরূপ ফল লাভ না হয়, কোনও প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়, তবে তারা মর্মযাতনা এবং অন্তর্দহনে নিপতিত হয়। এমনকি অনেক সময় বোধবুদ্ধি হারিয়ে উন্মাদ হয়ে পড়ে অথবা অসহায় হয়ে আদালতের ঘুরপাক খায়। এটা বাস্তব যে বেধর্মী ব্যক্তি এক অগ্নিকুণ্ডে থাকে, কেননা সে কখনই শান্তি ও স্বস্তি পায় না যা পরিতোষ ও আনন্দের আবশ্যিক পরিণাম। যেমন এক সুরাসক্ত ব্যক্তি এক গ্লাস সুরা পানের পর আরও চায় আর উত্তোরত্তর তার চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর সব সময় তার মধ্যে এক অতৃপ্ত বাসনা জেগে থাকে। অনুরূপভাবে একজন বস্তুবাদিও এক অগ্নিকুণ্ডে থাকে, কেননা তার বাসনা ও লালসার আগুন কখনও নির্বাপিত হয় না। বস্তুত, প্রকৃত সুখ ও শান্তি একজন মুত্তাকির জন্যই যার জন্য আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তার জন্য দুটি জান্নাত নির্ধারিত।

একজন মুত্তাকি কুঁড়ে ঘরে থেকেও সত্যিকার প্রশান্তি লাভ করতে পারে যা একজন বস্তুবাদি এবং লালসার দাস এক বিশালাকার দুর্গেও পায় না। তারা যতটা জাগতিক সুখ-সমৃদ্ধি পায় অনুরূপভাবে তারা অধিক বিপদাপদেরও সম্মুখীন হয়। অতএব, স্মরণ রেখো, প্রকৃত সুখ ও শান্তি বস্তুবাদির ভাগ্যে জোটে না। একথা ভেবো না যে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য, বহুমূল্য ও জমকালো পোশাক এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রশান্তির কারণ হতে পারে, কখনই নয়, প্রকৃত শান্তি তাকওয়ার উপরই নির্ভরশীল।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮০)

আজ চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, সর্বপ্রথম শিশুর কান কাজ করা শুরু করে এবং এরপর চোখ কাজ করে করতে শুরু করে এবং সব শেষে চিন্তা শক্তি কাজ করতে শুরু করে।এই পর্যায়ক্রমটিও প্রমাণ করে যে কুরআন করীম ঐশী বাণী। কেননা, এতে সেই রহস্য বর্ণিত হয়েছে যা সেই যুগে লুক্কায়িত ছিল।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহল এর ৭২ নং আয়াত

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

এর ব্যাখ্যায় বলেন: হে মানবজাতি! তোমরা মাতৃগর্ভে থাকাকালীন কিছুই জানতে জানতে না, সেই অবস্থা থেকে আমরা তোমাদেরকে চোখ, কান এবং হৃদপিণ্ড সহকারে পৃথিবীতে পাঠিয়েছি যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। কিন্তু তোমরা আমার এই দানকে কোনও কাজে লাগালে না। চোখ দিয়ে দেখলে না, কান দিয়ে শুনলে না আর হৃদয় দিয়ে ভেবেও দেখলে না। এই বাক্যটি কেমন দয়া ও আক্ষেপে পরিপূর্ণ! বান্দাদেরকে এই উদাসীনতা তাদেরকে শাস্তিযোগ্য করে তুলেছে, কিন্তু সর্বশক্তিমান খোদা তাদের এই উদাসীনতাকে কিরূপ স্নেহপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করছেন।

এরপর ২ পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সূরার বিষয়বস্তুর এই আয়াতটির সম্পর্ক হল এতে ঐশী ইলহামের প্রয়োজনীয়তার আও একটি প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। মানুষ যখন ভূমিষ্ঠ হয়,তখন কোনও কিছুই তার জানা থাকে না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাকে চোখ, কান এবং হৃদয় সহকারে সৃষ্টি করেন যাতে সে এগুলির সাহায্যে শিখতে পারে। কাজেই গতানুগতিক যে শিক্ষা মানুষ লাভ করে সেগুলি সবই খোদা প্রদত্ত উপকরণের মাধ্যমেই শেখা হয়। কোনও মানুষ একথা বলতে পারবে না যে, খোদা-প্রদত্ত উপকরণগুলির প্রয়োজন তার নেই আর সে নিজে থেকেই জ্ঞানার্জনের উপকরণ সৃষ্টি করতে পারবে। তবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের জন্য খোদা তা'লা যে সব উপায় উপকরণ সৃষ্টি করেন সেগুলির ব্যবহার করতে অস্বীকার করা হয় কেন?

আশ্চর্যের বিষয় হল মানুষের সকল শ্রেষ্ঠত্ব সেই উপকরণ ব্যবহারের মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে যা তাকে প্রকৃতি দান করে থাকে। মানুষ যে সমস্ত উৎকর্ষ অর্জন করতে পেরেছে তা সবই এই সব শক্তিবৃত্তির সাহায্যে। আর এই শক্তিবৃত্তিগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সে কোনও সংকোচ করে না। কিন্তু যখন আধ্যাত্মিক উপায় উপকরণের প্রশ্ন আসে,তখন সে বলে, 'আমার এসবের প্রয়োজন কি? আমি নিজেই নিজের কাজ করতে পারি। অথচ যেভাবে তার জাগতিক উন্নতির জন্য খোদা প্রদত্ত উপকরনের প্রয়োজন রয়েছে অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক ঔৎকর্ষ অর্জনের জন্য সেই সব উপকরণের প্রয়োজন যা আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় পূর্ণ প্রজ্ঞা দ্বারা তার জন্য সৃষ্টি করেন।

আয়াতের শেষে তিনি বলেছেন, এই সব বস্তু দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল তোমাদের মধ্যে যেন আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির মূল্যায়ন হয়। এর বিপরীতে তোমরা এই সব শক্তিগুলি নিয়ে গর্বিত হয়ে পড় আর দাবি কর যে তোমাদের কোনও বাহ্যিক সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

এই আয়াতে কানের পর চোখ এবং চোখের পর হৃদয়ের উল্লেখ করা হয়েছে আর ক্রমানুসারে এই অঙ্গাগুলিই মানুষের জ্ঞানার্জনের কারণ হয়। শিশুর কানদুটিই সর্ব প্রথম কাজ করে। তার পর চোখ এবং এই দুটির পর অন্তর বা চিন্তাশক্তি কাজ করে। আজ চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, সর্বপ্রথম শিশুর কান কাজ করা শুরু করে এবং এরপর চোখ কাজ করে করতে শুরু করে এবং সব শেষে চিন্তা শক্তি কাজ করতে শুরু করে। তাই দেখা যায় জীবজন্তুদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে কয়েকদিন পর তাদের বাচ্চাদের চোখ ফোটে। এই সময় শুধু তাদের কান কাজ করে। মানব শিশুর চোখ বাহ্যত ফুটে গেছে বলে হলেও সেগুলি কাজ করতে শুরু করে কান করতে শুরু করার পরেই। আর চিন্তাশক্তি অনেক পরে কাজ করতে শুরু করে। এই পর্যায়ক্রমটিও প্রমাণ করে যে কুরআন করীম ঐশী বাণী। কেননা, এতে সেই রহস্য বর্ণিত হয়েছে যা সেই যুগে লুক্কায়িত ছিল।

বস্তুত, নবুয়্যতের যুগ থেকে যখন কোনও জাতি দূরে চলে যায় তখন সেই জাতির অধিকারসমূহ মুষ্টিমেয় পরিবারের উত্তরাধিকার হিসেবে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। আর জনসাধারণকে জাগতিক কিম্বা ধর্মীয় কোনও বিষয়েই পরামর্শ দেওয়ার যোগ্য মনে করা হয় না। আর এই পার্থক্যটিকে এক মিথ্যা যোগ্যতার পরিণাম বলে ধরা হয়। এক বাদশহার আহম্মক সন্তানকে পৃথিবীর সব থেকে বুদ্ধিমান মানুষ বলে গণ্য করা হয়। আর সেই নির্বোধ নিজে এতটাই গর্বিত থাকে যে, যখন সে পৃথিবীর সামনে নিজের কোনও নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ ঘোষণা করে তখন সেই ঘোষণার মধ্যে বিভিন্ন অসংলগ্ন শব্দ ব্যবহার করে।

অনুরূপ অবস্থা ধর্মীয় জগতেরও। উলোমাদের পুত্ররা অর্ধেক জ্ঞান রাখে আর নিজেদের ভাবনাশক্তি থেকে বঞ্চিত থাকে। কিন্তু তাদেরকে মাশায়েখ এইজন্য বলা হয় যে তারা উলেমাদের সন্তান। আর তারা চায় লোকে তাদেরকে বিনা প্রশ্নে তাদের অজ্ঞতাপূর্ণ কথাবার্তা মেনে নিক। আর যে তাদের সামনে খোদা তা'লার বাণী উপস্থাপন করে তাকে সেই সব অবাস্তব কল্পকাহিনী এবং অর্থহীন বর্ণনা, যেগুলির কোনও প্রমাণ তাদের কাছে থাকে না, অস্বীকারকার করার দরুণ তারা তাকে কাফের ও মুরতাদ আখ্যায়িত করে বসে।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

প্রবেশিকা পরীক্ষা

জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ান

জামিয়া আহমদীয়া কাদিয়ান হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দ্বারা স্থাপিত সেই পবিত্র প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে এ যাবৎ শত-সহস্র উলেমা, মুবাল্লিগীন বের হয়ে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার গুরু দায়িত্ব পালন করছেন। সৈয়্যদানা হুযুর আনোর (আই.) অনেক স্থানে আহমদী ছাত্রদেরকে মসীহ মওউদ (আ.) দ্বারা স্থাপিত এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষা অর্জন করে জামাতের সেবা করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অতএব হুযুর আনোয়ারের নির্দেশের আলোকে সমধিক হারে ওয়াকফীনে নও এবং গায়ের ওয়াকফীনে নও ছাত্রদেরকে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হয়ে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে জামাতের সেবার জন্য আত্মোৎসর্গ করা উচিত।

জামিয়ার জন্য ২০২২-২০২৩ শিক্ষা বৎসর এপ্রিল, ২০২২ থেকে আরম্ভ হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রদের ভর্তি প্রক্রিয়া অনলাইনে হচ্ছে।

অতএব,যথাশীঘ্র ওয়াকফে নও ভারত (নাযারত তালিম) অফিস থেকে ভর্ত্তির ফর্ম চেয়ে তা পূর্ণ করে ওয়াকফে নও অফিসে পাঠিয়ে দিন। ভর্ত্তির ফর্ম চেয়ে পাঠানোর ই-মেল ঠিকানা - waqfenau@qadian.in

In-Charge Waqf-e-Nau Department
Office Waqfe-Nau India (Nazarat Taleem)
M.T.A Building, Civil Line, Qadian
District: Gurdaspur, Punjab (India) Pin: 143516

(নাযির তালিম ও সদর ন্যাশনাল ক্যারিয়ার প্ল্যানিং কমিটি ওয়াকফে নও ভারত)

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুস সানাআত-এ ভর্তি।

দারুস সানাত কাদিয়ানে নতুন বছর ২০২২-২০২৩-এর জন্য ভর্তি শুরু হয়েছে। ভর্তির পর নতুন সেশন-এর ক্লাস জুলাই মাস থেকে শুরু হবে। ইচ্ছুক যুবকরা যোগাযোগ করুন। দারুস সানাত প্রতিষ্ঠানটি NSIC দিল্লি নথিভুক্ত যার অধীন নিম্নোক্ত কোর্স করানো হচ্ছে।

Course	Fee	Duration
Certificate in computer applications	9000	1 Year
plumbing	6000	1 Year
Electrician	6000	1 Year
Welding	6000	1 Year
Diesel Mechanic	10000	1 Year
Motor Vechicle Mechanic	7000	1 Year
AC & Refrigerator	9000	1 Year

নোট: ফি-র টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করা যেতে পারে। ফি-র টাকা NSIC বোর্ডে যায়। কাদিয়ানের বাইরের আহমদী যুবকদের জন্য হোস্টেল এবং খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। যার জন্য কোনও অর্থ নেওয়া হয় না। বোর্ডের ফি ছাড়া অন্য কোনও ফি নেওয়া হয় না।

বিশদে জানতে নিচের নম্বরে ফোন করুন।

৯৮৭২৭২৫৮৯৫, ৮০৭৭৫৪৬১৯৮

(অধ্যাপক, দারুস সানাআত)

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০টা পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: **Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)**

জুমআর খুতবা

হযরত আলা (রা.) বললেন:হে লোকসকল! ভয় পেয়ো না। তোমরা কি মুসলমান নও? তোমরা কি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করতে আসনি? তোমরা কি আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী নও? ... তোমাদেরকে সুসংবাদ। কেননা যে অবস্থায় তোমরা রয়েছে এমন মানুষদেরকে আল্লাহ্ তা'লা কখনও নিঃসঙ্গ ত্যাগ করবেন না।

আঁ হযরত (সা.)–এর মহান মর্যাদাবান সাহাবী এবং খলীফায়ে রাশেদ হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)–এর যুগে বিদ্রোহী ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ২৪ জুন , ২০২২, **এর জুমুআর খুতবা (২৪ এহসান, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র যুগের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে (পরিচালিত) বিভিন্ন অভিযানের উল্লেখ করা হচ্ছিল।

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সপ্তম যে অভিযান পরিচালিত হয়েছিল, সে সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ অনুযায়ী এটি হযরত খালেদ বিন সাঈদ বিন আ'স (রা.)'র অভিযান ছিল যা মুরতাদ বিদ্রোহীদের দমনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদ বিন সাঈদ বিন আ'সের জন্য একটি পতাকা বাঁধেন এবং তাকে সিরিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চল হামকাতাইন অভিমুখে প্রেরণ করেন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৭)

হযরত খালেদ বিন সাঈদ বিন আ'স (রা.)'র আসল নাম খালেদ এবং ডাকনাম ছিল আবু সাঈদ। তার পিতার নাম ছিল সাঈদ বিন আ'স বিন উমাইয়্যা এবং মায়ের নাম লুবাইনা বিনতে হাব্বাব যিনি উম্মে খালেদ নামে সুপরিচিত ছিলেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৪) (আল মুসতাদরিক আলাস সালেহীন লিল হাকিম, ৫ম ভাগ, পৃ: ১৮৯৬, হাদীস–৫০৮১)

হযরত খালেদ ছিলেন একেবারে প্রাথমিক যুগের ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। অনেকের মতে, তিনি হযরত আবু বকর (রা.)'র পরেই ইসলাম গ্র হণ করেছিলেন এবং তিনি তৃতীয় অথবা চতুর্থ মুসলমান ছিলেন। আবার কারও কারও মতে, তিনি পঞ্চম মুসলমান ছিলেন। তাঁর পূর্বে তখন পর্যন্ত কেবল হযরত আলী বিন আবী তালেব (রা.), হযরত আবু বকর (রা.), হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.), হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াকাস (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত খালেদের ইসলামগ্রহণের ঘটনা হলো– তিনি স্বপ্নে দেখেন, (তিনি) অগ্নি কুণ্ডের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছেন আর তার পিতা তাকে তাতে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তিনি দেখেন, মহানবী (সা.) তার কোমর আঁকড়ে ধরে রেখেছেন যাতে তিনি আগুনের মধ্যে পড়ে না যান। হযরত খালেদ ভয়ে জেগে উঠেন এবং বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এই স্ব প্ন সত্য। এরপর হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে তার সাক্ষাৎ হলে তিনি হযরত আবু বকর (রা.)–কে নিজের স্বপ্ন শোনান, তাঁর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তোমার মঙ্গলের সিদ্ধান্ত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে রক্ষা করতে চান। ইনি তথা মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল, তাঁর অনুসরণ কর। কেননা, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর অনুসরণ কর তাহলে তিনি তোমাকে আগুনে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করবেন আর তোমার পিতা সেই আগুনে পড়তে যাচ্ছে। অতএব, হযরত খালেদ মহানবী (সা.)–এর সমীপে উপস্থিত হন।মহানবী (সা.) (তখন) মক্কায় আজইয়াদ (নামক) স্থানে ছিলেন। আজইয়াদ মক্কার সাফাপাহাড় সংলগ্ন একটি জায়গার নাম যেখানে মহানবী (সা.) ছাগপাল চরিয়েছিলেন। হযরত খালেদ (রা.) তাঁর (সা.)–এর সমীপে নিবেদন করেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি মানুষকে কার দিকে আহ্বান করেন? তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করি; যিনি একঅদ্বিতীয় এবং তাঁর কোনো শরীক নেই আর মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল। (আমি আরও বলি) তোমরা এসব পাথরের উপাসনা পরিত্যাগ কর, যারা শুনেও না আর দেখেও না আর কারও ক্ষতি বা উপকারও করতে পারে না। এছাড়া তারা জানেও না, কে তাদের উপাসনা করে আর কে করে না। তখন হযরত খালেদ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্‌র রসূল। হযরত খালেদ (রা.)'র ইসলাম গ্রহণে মহানবী (সা.) খুবই আনন্দিত হন। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত খালেদ (রা.) আত্মগোপন করেন। তার পিতা যখন তার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারে তখন সে তার অন্যান্য পুত্র যারা ইসলাম গ্রহণ করে নি তাদেরকে খালেদের সন্ধানে পাঠায়। ফলে তারা তাকে খুঁজে বের করে এবং তাকে ধরে তাদের পিতার কাছে নিয়ে আসে। তাদের পিতা হযরত খালেদ (রা.)–কে গালমন্দ করতে থাকে এবং মারধোর আরম্ভ করে আর হাতের লাঠি দিয়ে তাকে পেটাতে আরম্ভ করে এক পর্যায়ে তার মাথায় আঘাত করতে করতে (লাঠিটি) ভেঙে ফেলে। একই সাথে সে বলতে থাকে, 'তুমি মুহাম্মদ (সা.)–এর অনুসারী হয়েছ, অথচ তুমি তাঁর প্রতি তাঁর জাতির বিরোধিতা দেখতে পাচ্ছ আর সে তাদের উপাস্যদের যে দোষত্রুটি বর্ণনা করে এবং তাদের পূর্বপুরুষদের যে দোষত্রুটিও বলে বেড়ায় তাও দেখছ।' হযরত খালেদ উত্তরে বলেন, 'আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তাঁর (সা.) অনুসরণ করাকে শিরোধার্য করেছি!' এতে তার পিতা চরম রাগান্বিত হয় এবং তাকে বলে, 'হে নির্বোধ! আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও আর যেখানে খুশি চলে যাও। আমি তোমার খাবার বন্ধ করে দিব!' তখন হযরত খালেদ বলেন, 'আপনি যদি আমার খাবার বন্ধ করে দেন তাহলে আমার জীবিত থাকার জন্য আল্লাহ্ আমাকে রিযক্ দান করবেন।' অতঃপর তার পিতা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় এবং নিজের (অন্য) ছেলেদের বলে দেয়, তারা কেউই যেন তার সাথে কথা না বলে। অতএব, হযরত খালেদ (রা.) সেখান থেকে বের হন এবং মহানবী (সা.)–এর সাথেই থাকতে আরম্ভ করেন। মোটকথা, তিনি তার পিতার দৃষ্টি এড়িয়ে মক্কার পাশেই (কোথাও) থাকতেন পাছে (তার পিতা) তাকে আবার ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার আরম্ভ করে।

হযরত খালেদের পিতা মুসলমানদের ওপর অনেক বেশি অত্যাচার ও নিপীড়ন করত আর সে মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের একজন ছিল। একবার সে অসুস্থ হয়ে পড়ে আর রোগের তীব্রতার কারণে সে বলে, 'আল্লাহ্ যদি আমাকে এই রোগ থেকে আরোগ্য দেন; [জানা নেই সে আল্লাহ্ বলেছিল নাকি নিজের উপাস্যদের নাম নিয়েছিল, যাহোক সে বলেছিল,] আমি এই রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করলে ইবনে আবী কাবশা, অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)–এর খোদার ইবাদত আর মক্কায় হবে না। তখন আমি এমন অত্যাচার চালাব যে, এখান থেকে সব মুসলমানকে বের করে দেব। হযরত খালেদ (রা.) যখন একথা জানতে পারেন তখন তিনি (পিতার বিরুদ্ধে) দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! তাকে আরোগ্য দিও না। অতএব , সে এই রোগেই মারা যায়।

মুসলমানরা যখন দ্বিতীয় দফায় আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন, তখন হযরত খালেদও তাদের সাথে চলে যান; তার সাথে তার স্ত্রী উমায়মা বিনতে খালেদ খুযাইয়াও ছিলেন। হযরত খালেদের আরেক ভাই হযরত আমর বিন সাঈদও তাদের সাথে হিজরত করেছেন। হযরত খালেদ খায়বারের যুদ্ধের সময় আবিসিনিয়া থেকে হযরত জা'ফর বিন আবু তালেবের সাথে মহানবী (সা.)–এর সমীপে উপস্থিত হন। (তিনি) খায়বারের যুদ্ধে অংশ নেন নি, কিন্তু মহানবী (সা.) মালে গণিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে তাকেও ভাগ দেন। এরপর উমরাতুল কাযা, মক্কা বিজয়, হুনায়নের যুদ্ধ, তায়েফ ও তাবূ কের যুদ্ধসহ সব যুদ্ধেই তিনি মহানবী (সা.)–এর সহযোদ্ধা ছিলেন।

(উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৪-১২৫) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ৩০)

তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি, এই বঞ্চনার জন্য তিনি সর্বদা মনস্তাপ করতেন। (তিনি) মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা (তো) আপনার সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারি নি!'তিনি (সা.) উত্তরে বলেন, 'তুমি কি এটি পছন্দ করবে না যে, অন্যরা এক হিজরতের সৌভাগ্য লাভ করেছে এবং তুমি দু'বার হিজরতের সৌভাগ্য লাভ করেছ?'

(তাবাকাত ইবনে সাআদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭৫)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) 'দীবাচাহ্ তফসীরুল কুরআনে' যেসব ওহী লেখকের নাম উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে হযরত খালেদ বিন সাঈদ বিন আ'সের নামও রয়েছে।

(দীবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৪২৫)

হযরত খালেদ বিন সাঈদ (রা.)-কে মহানবী (সা.) ইয়েমেনের যাকাত সংগ্রহ করার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। মহানবী (সা.)-এর তিরোধান পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে ই (নিয়োজিত) ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর (তিনি) মদীনা চলে আসলে হযরত আবু বকর (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি ফিরে এলে কেন?' (উত্তরে) তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর পর তিনি অন্য কারও হয়ে কাজ করবেন না। কথিত আছে, তিনি হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত করতে বিলম্ব করেছিলেন; কিন্তু বনু হাশেম হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত করলে হযরত খালেদও হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত করেন। পরবতীতে হযরত আবু বকর (রা.) তাকে বিভিন্ন সময়ে সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন।

হযরত খালেদ (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে 'মারজুস সুফ্‌র' এর যুদ্ধে শহীদ হন। আবার অনেকের মতে, 'মারজুস সুফ্‌র' এর যুদ্ধ যেহেতু চতুর্দশ হিজরীতে হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালের প্রারম্ভে আরম্ভ হয়েছিল, (তাই) বলা হয়; হযরত খালেদ (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র ইন্তেকালের চব্বিশ দিন পূর্বে সিরিয়ায় আজনাদীনের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

(উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৫)

তাবারীর ইতিহাসে হযরত খালেদ(রা.)'র মুরতাদদের বিরুদ্ধে অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ এভাবে এসেছেহযরত আবু বকর (রা.) যখন মুরতাদদের দমনের লক্ষ্যে পতাকা বাঁধেন এবং লোক নির্বাচনের কাজ সমাপ্ত করেন; তখন তাদের মধ্যে খালেদ বিন সাঈদ (রা.)ও ছিলেন। হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে, তাকে আমীর নিযুক্ত করতে নিষেধ করেন এবং নিবেদন করেন, আপনি তাকে দিয়ে কোন কাজ করাবেন না। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, না। (তিনি) হযরত উমর (রা.)'র সাথে দ্বিমত করেন। আর হযরত খালেদকে তায়মাতেসাহায্যকারী বাহিনীতে নিযুক্তি দেন। তায়মা সিরিয়া ও মদীনার মধ্যবতী একটি প্রসিদ্ধ শহর। অতএব, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদ বিন সাঈদকে তায়মা যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, নিজ স্থান থেকে সরবে না আর চতুর্দিকের লোকদেরকে তোমার দলে যোগ দেওয়ার জন্য আহবান জানাবে। আর কেবল তাদেরকেই দলে নিবে যারা মুরতাদ হয় নি। আমার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কারও সাথে (আগ বাড়িয়ে) যুদ্ধ করবে না, তবে তারা ব্যতীত যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। হযরত খালেদ (রা.) তায়মাতে অবস্থান করেন এবং চারদিকের বিভিন্ন দল তার সাথে এসে মিলিত হয়। মুসলমানদের এই মহান সৈন্যবাহিনীর সংবাদ রোমানরা পাওয়ার পর তারা তাদের অধীনস্থ আরবদের কাছে সিরিয়ার যুদ্ধের জন্য সৈন্য চেয়ে পাঠায়। হযরত খালেদ (রা.) রোমানদের প্রস্তু তি ও আরব গোত্রগুলোর আগমন সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.)-কে অবহিত করেন। হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে লিখেন, তোমরা অগ্রসর হও, বিন্দুমাত্র ভীত হবে না, আর আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর।

এই উত্তর পাওয়া মাত্রই হযরত খালেদ (রা.) শত্রুদের অভিমুখে অগ্রসর হন আর যখন শত্রুসেনার কাছে পৌঁছেন তখন শত্রুদের মধ্যে এমন ত্রাসের সঞ্চার হয় যে, সবাই নিজ জায়গা পরিত্যাগ করে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। হযরত খালেদ (রা.) শত্রুঘঁ াটি দখল করে নেন। হযরত খালেদের কাছে যারা একত্র হয়েছিল তাদের অধিকাংশ মুসলমান হয়ে যায়। এই সফলতার খবর হযরত খালেদ (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে প্রেরণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) জবাবে লিখেন, তুমি সম্মুখে অগ্রসর হও তবে এতটা অগ্রসর হয়ো না পাছে পিছনে শত্রু আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে যায়।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩১-৩৩২) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ৭৮)

ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে মুরতাদদের বিরুদ্ধে হযরত খালেদ বিন সাঈদ (রা.)'র কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কেবল এতটুকুই জানা যায়। এছাড়া হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফাতকালে সিরিয়ার বিজয়াভিযানের বিভিন্ন ঘটনাতেও তাঁর যে ভুমিকা রয়েছে তা আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

মুরতাদ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অষ্টম যুদ্ধাভিযানটি ছিল হযরত তুরায়ফা বিন হাজেযের পক্ষ থেকে। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত তুরায়ফা বিন হাজেযের জন্য একটি পতাকা বাঁধেন এবং তাকে বনু সুলায়েম এবং বনু হাওয়াযেনের মোকাবিলা করার নির্দেশ প্রদান করেন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৭) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ৭৮)

একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আবু বকর (রা.) বনু সুলায়েম ও বনু হাওয়াযেন গোত্রের মোকাবিলার জন্য মা'আন বিন হাজেযকে প্রে রণ করেছিলেন। যাহোক, আল্লামা ইবনে আব্দুল বার তাঁর আল্ ইস্তিয়াব পুস্তকে হযরত তুরায়ফা এবং হযরত মা'আনের পিতার নাম হাজেয, অর্থাৎ 'যা' দিয়ে এবং আল্লামা ইবনে আসীর উসদুল গাবা পুস্তকে হাযের, অর্থাৎ 'রা' দিয়ে লিখেছেন।

(আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০৮) (আল ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৬) (উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৩)

খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত তুরায়ফা বিন হাজেযকে (বনু) সুলায়েমের এসব আরবের গভর্নর নিযুক্ত করেন যারা ইসলাম ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান ও উদ্যমী কর্মী ছিলেন। তিনি এমন প্রভাব বিস্তারী বক্তৃতা করেন যে, বনু সুলায়েমের অনেক আরব তাঁর সাথে যুক্ত হয়ে যায়।

(হযরত আবু বাকার কে সরকারি খুতুত, পৃ: ৩৩)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর (রা.) বর্ণিত আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে, বনু সুলায়েমের অবস্থাএমন ছিল যে, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর তাদের অনেকেই মুরতাদ হয়ে যায় এবং কুফরের দিকে ফিরে যায় আর তাদের কিছু লোক স্বীয় গোত্রের আমীর মা'আন বিন হাজেয অথবা কারও কারও মতে তার ভাই তুরায়ফা বিন হাজেযের সাথে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) যখন তুলায়হার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হন তখন হযরত আবু বকর (রা.) মা'আনকে লিখেন, বনু সুলায়েম গোত্রের যারা ইসলামের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত তাদেরকে নিয়ে হযরত খালিদ (রা.)'র সাথে যাও। হযরত মা'আন (রা.) নিজ স্থানে তার ভাই তুরায়ফা বিন হাজেযকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে হযরত খালেদ (রা.)'র সাথে বেরিয়ে পড়েন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬৬)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবী বকর (রা.)'র পক্ষ থেকেই আরও একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে আর সেটি হলো- বনু সুলায়েম গোত্রের এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রা.)'রসকাশে উপস্থিত হয়, তাকে ফুজা'আ বলা হত। আসলে তার নাম ছিল, আইয়্যায বিন আব্দুল্লাহ্। ফুজা'আ শব্দে আকস্মিকতার অর্থ পাওয়া যায়, কেননা এই ব্যক্তি পথচারী ও গ্রামবাসীদের ওপর অতর্কিতে হানা দিয়ে তাদের (ধনসম্পদ) লুট করে নিত, এজন্য তার ফুজা'আ নামটি প্রসিদ্ধি পায়। যাহোক, সে হযরত আবু বকর (রা.)'র সমীপে উপস্থিত হয়ে বলে, আমি একজন মুসলমান আর আমি সেসব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই যারা ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছে। তাই আপনি আমাকে বাহন দিন এবং সাহায্য করুন। হযরত আবু বকর (রা.) তাকে বাহন দেন এবং অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করেন। এক স্থানে এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত আবু বকর (রা.) তাকে দু'টি ঘোড়া অথবা অন্য একটি রেওয়ায়েত অনুসারে ত্রিশটি উট এবং ত্রিশজন সৈন্যের অস্ত্র শস্ত্র প্রদান করেন, এছাড়া দশজন সশস্ত্র মুসলমানকে তার সাথে প্রেরণ করেন। এই ব্যক্তি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং পথিমধ্যে যে মুসলমান বা মুরতাদই তার সামনে আসত তাদের ধনসম্পদ সে ছিনিয়ে নিত আর যে ব্যক্তি (সম্পদ দিতে) অস্বীকৃতি জানাত তাকে সে হত্যা করত। সবার সাথে সে একই আচরণ করছিল, মুসলমানদেরকেও হত্যা করত, শহীদ করে দিত। তার সাথে বনু শরীদ গোত্রের এক ব্যক্তিও ছিল, তাকে নাযেবা বিন আবু মায়সা নামে ডাকা হত।একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, ফুজা'আ তার গোত্রের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে থাকে এবং পথে সে মুরতাদ আরবদেরকে তার সাথে যুক্ত করতে থাকে।

এভাবে তার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে গেলে প্রথমে সে তার মুসলমান সঙ্গীদের হত্যা করে এবং তাদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নিতে শুরু করে।

এরপর সে নির্বিচারে লুটতরাজ চালাতে থাকে। কখনো এই গোত্রে আবার কখনো সেই গোত্রে অতর্কিতে আক্রমন করত। মুসলমানদের একটি

দল মদীনায় যাচ্ছিল, সে তাদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেয় এবং তাদের হত্যা করে। প্র থমে (মালামাল) ছিনিয়ে নেয় আর পরে হত্যা করে এবং শহীদ করে দেয়। হযরত আবু বকর (রা.) এ বিষয়টি অবগত হওয়ার পর হযরত তুরায়ফা বিন হাজেয (রা.)-কে লিখেন কিংবা কারও কারও মতে হযরত আবু বকর (রা.) এ নির্দেশটি মূলত মা'আনকে দিয়েছিলেন আর তিনি তার ভাই তুরায়ফাকে পাঠিয়েছিলেন। যাহোক, হযরত আবু বকর (রা.) লিখেন, আল্লাহ্‌র শত্রু ফুজা'আ আমার কাছে এসে বলেছিল, সে নাকি মুসলমান। সে আমার কাছে দাবি করে, ইসলাম পরিত্যাগকারী মুরতাদদের বিরুদ্ধে আমি যেন তাকে (যুদ্ধের জন্য) শক্তির যোগান দিই। তাই আমি তাকে বাহন ও অস্ত্রশস্ত্র দেই। কিন্তু এখন আমি নিশ্চিতভাবে জেনে গেছি যে, এই আল্লাহ্‌র শত্রু মুসলমান এবং মুরতাদদের নিকট গিয়ে তাদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেয় আর যে-ই তার বিরোধিতা করেছে তাকে সে হত্যা করেছে। অতএব, তোমার সাথী মুসলমানদের তুমি সাথে নিয়ে যাও এবং তাকে হত্যা কর অথবা গ্রেফতার করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। একটিরেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত তুরায়ফা (রা.)'র সাহায্যের জন্য হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েস (রা.)-কেও প্রেরণ করেন। হযরত তুরায়ফা বিন হাজেয (রা.) তার সাথে যুদ্ধ করতে যান। এই দু 'টি দল যখন পরস্পরের মুখোমুখি হয় তখন প্র থমে শুধু তির বিনিময় হয়। একটি তির নাজওয়া বিন আবু মায়সার গায়ে বিদ্ধ হয়, ফলে তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়। মুসলমানদের বীরত্ব ও দৃঢ়তা দেখার পর ফুজা'আ হযরত তুরায়ফা (রা.)-কে বলে, একাজ করার অধিকার আমার চেয়ে তোমার বেশি নয়। তুমিও হযরত আবু বকর (রা.) কর্তৃক নিযুক্ত আমীর আর আমিও তাঁর নিযুক্ত আমীর। সে তাঁকে অত্যন্ত ধূর্ত তার সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। হযরত তুরায়ফা (রা.) তাকে বলেন, সত্যবাদী হয়ে থাকলে অস্ত্র সমর্পণ কর। তোমাকে গ্রেফতারের জন্য হযরত আবু বকর (রা.) আমাকে প্রেরণ করেছেন।

কাজেই, অস্ত্র সমর্পণ কর এবং আমার সাথে হযরত আবু বকর (রা.)'র নিকট চল। সেখানেই সমাধা হয়ে যাবে তু মি আমীর কিনা? অতএব, ফুজা'আ হযরত তুরায়ফা (রা.)'র সাথে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে আর তারা দু 'জনই হযরত আবু বকর (রা.)'র সমীপে উপস্থিত হলে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত তুরায়ফা (রা.)-কে নির্দে শ দিয়ে বলেন, তাকে বাকী'তে নিয়ে গিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেল। তার সাথে এই আচরণ করার কারণ হলো- মুসলমানদের সাথেও সে একই আচরণ করত। হযরত তুরায়ফা তাকে সেখানে নিয়ে যান এবং আগুন জ্বালিয়ে তাকে তাতে নিক্ষেপ করেন। এক রেওয়ায়েতে আছে, যুদ্ধ চলাকালে ফুজা'আ পালিয়ে গেলে হযরত তুরায়ফা তার পিছু ধাওয়া করে তাকে বন্দী করেন এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র নিকট প্রেরণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে এলে তিনি (রা.) তার জন্য মদীনায় বড় পরিসরে আগুন জ্বালিয়ে তার হাত পা বেঁধে তাকে তাকে নিক্ষেপ করেন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬৬) (হযরত আবু বাকার কে সরকারি খুতুত, প্রণেতা- খুরশেদ আহমদ ফারুক, পৃ: ৩৩-৩৪) (ফুতুহুল বুলদান, লিল বালাযারি, অনুবাদ-উর্দু, পৃ: ১৫২)

নবম অভিযানটি ছিল হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.)'র যা বিদ্রোহী মুরতাদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) একটি পতাকা হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.)-কে প্রদান করেন এবং তাকে বাহরাইনে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৭)

বাহরাইন,ইয়ামামা এবং পারস্য উপসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এতে বর্তমান কাতার এবং বাহরাইনের এমারতের শাসনও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি বর্তমানের ছোট বাহরাইন নয়, বরং এটি সে সময় বিস্তৃত অঞ্চল ছিল। এর রাজধানী ছিল দারীন। মহানবী (সা.)-এর যুগে মুনযের বিন সাওয়া এখানকার শাসক ছিলেন, যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সে যুগে বাহরাইন বা সৌদি আরবকে আল আসা বলা হতো।

(এটলাস সীরাতুন নবী, পৃ: ৬৮)

হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.)'র পরিচয় নিম্নরূপ: তাঁর নাম ছিল আলা এবং তার পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ । তিনি ইয়েমেনের হাযার মওতের অধিবাসী ছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগেই তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.)'র এক ভাই আমর বিন হাযরামী ছিল মুশরিকদের প্রথম ব্যক্তি যাকে এক মুসলমান হত্যা করেছিল এবং তার সম্পদই সর্বপ্রথম খুমুস হিসেবে ইসলামের হাতে আসে। বদরের যুদ্ধের মৌলিক এবং তাৎক্ষণিক কারণসমূহের মাঝে এই হত্যাকেও একটি কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.)'র এক ভাই আমের বিন হাযরামী বদরের দিন অবিশ্বাসের মাঝে মারা পড়ে। মহানবী (সা.) যখন রাজা-বাদশাহ্‌দের প্রতি তবলীগি পত্র প্রেরণ করেন তখন বাহরাইনের শাসক মুনযের বিন সাওয়ার নিকট পত্র নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.)'র ওপর ন্যস্ত হয়। এরপর মহানবী (সা.) তাঁকে বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত করেন।

হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.) তাকে ইসলামেরদাওয়াত দিলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মুনযের যখন ইসলামের দাওয়াত পান তখন তার প্রতিক্রিয়া এরূপ ছিল যে, আমি এ বিষয়ে অনেক ভেবেচিন্তে দেখেছি, আমার হাতে যা আছে তা এ দুনিয়ার জন্য, পরকালের জন্য নয়। অর্থাৎ, আমার কাছে যা কিছুই আছে তা জাগতিকতা আর পারলৌকিক কোন প্রস্তুতি আমার নেই।

কিন্তু আমি যখন তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করলাম তখন এটিকে ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের জন্য কল্যাণজনক পেয়েছি। অতএব, ধর্ম গ্রহণে আমাকে কোন কিছুই বাধা দিতে পারবে না।

ইসলামের সত্যতা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এতে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্যে রয়েছে জীবনের আশা-ভরসা এবং মৃত্যুর প্রশান্তি। তিনি বলেন, কাল পর্যন্ত আমি তাদের সম্পর্কে আশ্চর্য হতাম যারা একে গ্রহণ করত, কিন্তু আজ আমি তাদের দেখে আশ্চর্য হচ্ছি যারা একে প্রত্যাখ্যান করে। এই শিক্ষার সৌন্দর্য সম্পর্কে জানার পর এখন আমার চাওয়া-পাওয়া বদলে গিয়েছে। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) আনীত শরীয়তের মাহাত্ম্যের দাবি হলো- মহানবী (সা.)-কে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া।

মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত হযরত আলা বিন হাযরামী(রা.) বাহরাইনের গভর্নর ছিলেন। পরবর্তীতে হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালেও তিনি সেই পদেই অধিষ্ঠিত থাকেন এবং হযরত উমর (রা.)ও তাঁর খিলাফতকালে আমৃত্যু তাকে এ দায়িত্বেই বহাল রাখেন ।

(উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭১) (সীয়ারুস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৯৭-৩৯৮) (সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- ডক্টর আলি মহম্মদ সালাবী, উর্দু অনুবাদ, পৃ: ৩৩৯)

তাবকাত ইবনে সা'দের বর্ণনা অনুসারে বাহরাইনের অধিবাসীরা একবার হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.)'র বিরুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর নিকট অভিযোগ করলে মহানবী (সা.) তাকে অপসারণ করেন এবং হযরত আবান বিন সাঈদ বিন আ'স (রা.)-কে গভর্নর নিযুক্ত করেন। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর সেখানে যখন ধর্মত্যাগ ও বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করে তখন হযরত আবান মদীনায় ফেরত চলে আসেন এবং পদত্যাগ করেন। আর হযরত আবু বকর (রা.) তাকে পুনরায় বাহরাইন পাঠাতে চাইলে তিনি এই বলে অপারগতা প্রকাশ করেন যে, মহানবী (সা.)-এর পর আমি এখন আর অন্য কারও কর্ম কর্তা হব না। এতে হযরত আবু বকর (রা.) পুনরায় হযরত আলা বিন হাযরামীকে বাহরাইনের কর্মকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন; যাতে তিনি আমৃত্যু বহাল ছিলেন।

হযরত আলা (রা.) এমন (পুণ্যবান হিসেবে) খ্যাতি রাখতেন যার দোয়া গৃহীত হতো। তার ব্যাপারে এ সংক্রান্ত অনেক রেওয়াত বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বলতেন, তার গুণাবলী ও দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়টি আমার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছে। তিনি রেওয়ায়েতে অন্য অনেক বিষয়ের পাশাপাশি এটিও বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি মদীনা থেকে বাহরাইনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে পানি শেষ হয়ে যায়। তিনি আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করেন আর দেখতে পান যে, বালুর নীচ থেকে একটি ঝর্ণা প্রস্ফুটিত হয়েছে এবং আমরা সবাই পরিতৃপ্ত হই।

অতঃপর হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি আলা'র সাথে বাহরাইন থেকে সেনাবাহিনী সহ বসরা অভিমুখে রওয়ানা হই। আমরা লিয়াস নামক স্থানে ছিলাম এমন সময়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। লিয়াস বনু তামীম-এর এলাকাস্থ একটি গ্রামের নাম। আমরা এমন স্থানে ছিলাম যেখানে পানি ছিল না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য এক খণ্ড মেঘ দৃশ্যমান করেন বা নিয়ে আসেন যা আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করে। আমরা তাকে গোসল দিই আর নিজেদের তরবারি দিয়ে তার জন্য কবর খনন করি। আমরা তার জন্য লাহাদ বানাইনি। আমরা লাহাদ বানানোর উদ্দেশ্যে ফিরে আসি, অর্থাৎ, স্বল্পকাল পরে ফেরত গিয়ে দেখি; কিন্তু তার কবরের স্থান আর খুঁজে পাই নি।

(তাবাকাত ইবনে সাআদ, উর্দু অনুবাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৭৫-৩৭৭)

তার মৃত্যুর ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে। কারও কারও মতে তার মৃত্যু চৌদ্দ হিজরীতে হয়েছিল, আবার কারও কারও মতে একুশ হিজরীতে হয়েছিল।

(উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড,ঃ ৭১)

বাহরাইনের পরিস্থিতির ব্যাপারে উল্লিখিত আছে যে, বাহরাইন হীরার বাদশাহ্দের অধীনে ছিল। হীরার বাদশাহ্রা ইরানের বাদশাহ্দের অধীনে ছিল। হীরা ইসলামের পূর্বে ইরাকের বাদশাহ্দের শাসনকেন্দ্র ছিল। বাহরাইনের সমুদ্র তীরবর্তী ও বাণিজ্যিক শহরগুলোতে মিশ্র জনবসতি ছিল। সেখানে পারসী, খ্রিস্টান, ইহুদী ও জাটরাও ছিল। আরবের ব্যবসার ওপর পারসীয়ানদের প্রাধান্য ছিল। এসব এলাকায় ব্যবসায়ীদের একটি দলেরও বসতি ছিল যারা ভারত এবং ইরান থেকে এসেছিল আর ফুরাত নদীর উৎপত্তিস্থল (বা মুখ থেকে) আদান এর উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। এই ব্যবসায়ীরা এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করেছিল। আর তাদের মাধ্যমে যেসব বংশধর জন্ম নিয়েছিল তাদেরকে 'আবনা' নামে ডাকা হতো।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা– মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, উর্দু অনুবাদ, পৃ: ২৩৭)(ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ১১০)

উপকূলীয় শহরগুলোর পেছনে তিনটি বড় গোত্র আর তাদের অনেকগুলো শাখার বসতি ছিল। একটি হলো, বকর বিন ওয়ায়েল, দ্বিতীয় আব্দুল কায়েস এবং তৃতীয়টি ছিল রবীআ। তাদের অনেক বংশ ছিল খ্রিস্টান। ঘোড়া, উট এবং ছাগল পালন এবং খেজুরের বাগান করা তাদের প্রধান পেশা ছিল। এসব গোত্রের ব্যবস্থাপক সেসব স্থানীয় নেতা হতো যারা হীরা সরকারের আস্থাভাজন হতো। তাদের মাঝে একজন ছিল মুনযের বিন সাবা, যে বাহরাইনের হাযার জেলায় বসবাস করতো এবং হাযার এর আশেপাশে আব্দুল কায়েস গোত্রের ওপর তার রাজত্ব ছিল।

(হযরত আবু বাকার কে সরকারী খুতুত, পৃ: ৪৮)

আব্দুল কায়েস গোত্রের দু'টি প্রতিনিধিদল মহানবী (সা.)–এর সমীপে উপস্থিত হয়। একটি প্রতিনিধিদল পঞ্চম হিজরীতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সমীপে উপস্থিত হয়েছিল, যাতে তেরো বা চৌদ্দজন সদস্য ছিল। আর আব্দুল কায়েস গোত্রের দ্বিতীয় প্র তিনিধিদল 'আমুল উফুদ' অর্থাৎ, নবম হিজরীতে দ্বিতীয়বার মহানবী (সা.)–এর সকাশে উপস্থিত হয়েছিল, যেটিতে জারূতসহ চল্লিশজন সদস্য ছিল। জারূত খ্রিস্টান ছিল, যে এখানে এসে ইসলাম গ্রহণ করে।

(এটলাস সীরাত নববী, পৃ: ৪৩৮)

একটি উক্তি অনুসারে উক্ত প্রতিনিধিদল মহানবী (সা.)–এর কাছে আসার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

(যারকানী, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৪১)

হাযার এর পারসীয়ান, খ্রিস্টান এবং ইহুদীরা নিতান্ত অনিচ্ছায় জিযিয়া বা কর দিতে সম্মত হয়েছিল। বাহরাইনের অন্যান্য বসতি এবং শহরগুলো অমুসলিম রয়ে যায়, কিন্তু তারা যখনই সুযোগ পেতো বিভিন্ন সময়ে বিদ্রোহ করতো।

(হযরত আবু বাকার কে সরকারী খুতুত, পৃ: ৪৮)

মুনযের বিন সাবার ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (সা.) তাকে রীতিমতো বাহরাইনের গভর্নর হিসেবেই নিযুক্ত রাখেন। ইসলামগ্রহণের পর তিনি তার জাতিকেও সত্য ধর্মের তবলীগ করতে আরম্ভ করেন এবং জারূত বিন মুয়াল্লাকে ধর্মীয় শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.)–এর সমীপে প্রেরণ করেন। জারূত মদীনা পৌঁছে ইসলামী শিক্ষামালা এবং আদেশনিষেধ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন এবং স্বজাতির কাছে ফিরে গিয়ে মানুষের মাঝে সত্য ধর্মে র প্রচার এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার কাজ আরম্ভ করেন। মহানবী (সা.)–এর তিরোধানের কয়েক দিন পর, অর্থাৎ ১১ হিজরী সনে, মুনযেরও মৃত্যুবরণ করেন। এতে আরব এবং অনারব সবাই বিদ্রোহ করে বসে। আব্দুল কায়েস গোত্র বলে, যদি মুহাম্মদ (সা.) নবী হতেন তাহলে তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করতেন না আর সবাই মুরতাদ হয়ে যায়। হযরত জারূত এই সংবাদ পান। হযরত জারূত তার গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের একজন ছিলেন, যিনি শিক্ষাদীক্ষার উদ্দেশ্যে মদীনায় গিয়েছিলেন, আর তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা মহানবী (সা.)–এর কাছে হিজরত করেছিলেন এবং একজন সুবক্তা ছিলেন।

(আল বাদাইয়াতু ওয়ান নাহাইয়াহ, ৯ম খণ্ড, প: ৪৭৫–৪৭৬)

মহানবী (সা.) কেন মৃত্যুবরণ করবেন এ অজুহাতে যারা যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল তাদের সবাইকে হযরত জারূত একত্রিত করেন আর বক্তৃতা করার জন্য দাঁড়ান এবং বলেন, হে আব্দুল কায়েস গোত্র! আমি তোমাদেরকে একটি বিষয় জিজ্ঞেস করছি, যদি তোমাদের এর উত্তর জানা থাকে তাহলে আমাকে বলবে। আর যদি তোমাদের তা না জানা থাকে তাহলে বলার প্রয়োজন নেই। তারা বলল, যা ইচ্ছা প্রশ্ন কর। হযরত জারূত বলেন, তোমরা কি জানো অতীতেও আল্লাহ্ তা'লার নবীগণ পৃথিবীতে এসেছেন? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। হযরত জারূত বলেন, তোমরা কি কেবল জানো নাকি তোমরা তাদের দেখেছ? তারা উত্তরে বলল, না! আমরা তাদের দেখি নি, আমরা কেবল তাদের সম্পর্কে জানি। হযরত জারূত (রা.) বলেন, তাহলে তারা কোথায় গিয়েছে? তখন লোকেরা বলল, তারা মৃত্যু বরণ করেছেন। তখন হযরত জারূত (রা.) বলেন, অনুরূপভাবে মুহাম্মদ (সা.)'ও মৃত্যু বরণ করেছেন যেভাবে তারা সবাই মৃত্যু বরণ করেছেন।আর আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল।

তার এই বক্তৃতা শুনে ও প্র শ্নোত্তরের পর তার জাতি বলে, আমরাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর নিশ্চয় মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল। আর আমরা তোমাকে আমাদের মাঝে সম্মানিত এবং আমাদের নেতা হিসেবে মান্য করছি। এভাবে তারা ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং ধর্মত্যাগের মহামারি তাদের আক্রান্ত করে নি।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮৫)

বাকি আরব এবংঅনারব সবাই মদীনার কর্তৃত্ব নস্যাৎ করার জন্য কোমর বেঁধে নেমেছিল। পারস্য সাম্রাজ্য তাদেরকে প্ররোচিত করে এবং বিদ্রোহের নেতৃত্ব একজন বড় আরব নেতার হাতে অর্পণ করে। হাযর–এ মহানবী (সা.)–এর প্রতিনিধি আবান বিন সাঈদ বিন আস বিদ্রোহের কালো মেঘ দেখে মদীনায় চলে আসেন।

(হযরত আবু বাকার সে সরকারী খুতুত, পৃ: ৪৯)

বনু আব্দুল কায়েস গোত্রের কিছু মানুষ যদিও বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু বাহরাইন এর অন্যান্য গোত্র হুতুম বিন যুবায়া–র নেতৃত্বে যথারীতি মুরতাদ থেকে যায়। আর তারা রাজত্বকে পুনরায় মুনযের–এর বংশে এনে মুনযের বিন নোমানকে নিজেদের বাদশাহ্ বানিয়ে নেয়। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে,

তারা যখন মুনযের বিন নোমানকে বাদশাহ্ বানানোর সিদ্ধান্ত নেয় তখন তাদের গণ্যমান্য ও নেতৃস্থানীয়রা ইরানের বাদশাহ্ কিসরার কাছে যায়। তারা তার সামনে উপস্থিত হওয়ার আবেদন করে। কিসরা তাদের অনুমতি দিলে তারা বাদশাহ্দের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে তার সামনে উপস্থিত হয়। কিসরা বলে, হে আরবের গোত্র! কী কারণে তোমরা এখানে এসেছ? তারা বলল, হে বাদশাহ্! আরবের সেই ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করেছে যাকে কুরাইশ এবং মুনযের সম্প্রদায়ের সকল গোত্র সম্মানিত মনে করতো। তাদের এ কথায় তারা মহানবী (সা.)–কে বুঝিয়েছিল। এরপর তারা বলে, আর তাঁর পর এক ব্যক্তি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন যিনি শীর্ণকায় ও দুর্বল চিন্তার অধিকারী। অর্থাৎ, হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে এই মতামত ব্যক্ত করে। আর তার গভর্নররা নিজেদের সাথীর কাছে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে ফিরে গিয়েছে। আজ বাহরাইনের এলাকা তাদের হস্তচ্যুত। আব্দুল কায়েস এর ছোট একটি দল ছাড়া আর কেউ ইসলাম ধর্মে প্রতিষ্ঠিত নেই। আমাদের কাছে তাদের কোন গুরুত্ব নেই এবং অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর দিক থেকে তাদের চেয়ে আমাদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। আপনি এমন কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করুন যে বাহরাইন করায়ত্ব করতে চাইলে কেউ যেন তাকে বাধাগ্রস্ত করতে না পারে। তখন কিসরা তাদেরকে বলে, তোমরা কাকে পছন্দ কর যাকে আমি তোমাদের সাথে বাহরাইন প্রেরণ করতে পারি? তারা বলল, বাদশাহ্ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারেন। কিসরা বলে, মুনযের বিন নোমান বিন মুনযের–এর ব্যাপারে তোমাদের মতামত কী? তারা বলল, হে বাদশাহ্! আমরা তাকেই পছন্দ করি এবং আমরা তাকে ছাড়া আর কাউকে চাই না। এরপর কিসরা মুনযের বিন নোমানকে ডেকে পাঠায়। সে সদ্য যৌবনে পা রেখেছে যার কেবল নতুন দাড়ি গজিয়েছিল। বাদশাহ্ তাকে শাহী পোশাক দান করে এবং মুকুট পরিধান করায় আর একশ অশ্বারোহী দান করে ও আরো সাত হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী দিয়ে তাকে বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের সাথে বাহরাইন যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করে এবং তার সাথে আবু যুবায়া হুতুম বিন যায়েদকে পাঠায়, যার নাম ছিল শুরাইহ বিন যুবায়া। সে বনু কায়েস বিন সালাবার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং হুতুম তার উপাধি ছিল। সে ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া যাবিয়ান বিন আমর এবং মুসমি বিন মালিকও ছিল।

(কিতাবুর রাদ্দাতু লিল ওয়াকদি, পৃ: ১৪৭–১৪৯)

সর্বপ্রথম তারা হযরত জারূত এবং আব্দুল কায়েস গোত্রকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। এই প্রেক্ষিতে হুতুম বিন যুবায়া বল প্রয়োগ করে তাদেরকে পদানত করার চেষ্টা করে। সে কাতীফ

এবং হাযর- এ বসবাসরত বিদেশী ব্যবসায়ীদের ও সেমব লোক যারা ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাদেরকে নিজের সাথে মিলিয়ে নেয়।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ২৩৮-২৩৯)

আব্দুল কায়েস গোত্রের চার হাজার লোক নিজেদের নেতা হযরত জারূত বিন মুআল্লা (রা.)'র নিকট তাদের মিত্র ও দাসসহ সমবেত হয়। আর বকর বিন ওয়ায়েল গোত্র তাদের নয় হাজার ইরানী এবং তিন হাজার আরবসহ তাদের নিকটবতী হয়।

অতঃপর দুই পক্ষের মাঝে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয় এবং বকর বিন ওয়ায়েল গোত্র ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখিন হয়। তাদের এবং ইরানীদের মধ্য থেকে বহু সংখ্যক (লোক) নিহত হয়। পুনরায় তারা দ্বিতীয়বার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করে। এবার আব্দুল কায়েস গোত্রের অনেক ক্ষতি হয়। এভাবে তারা একে অপরের থেকে প্রতিশোধ নিতে থাকে এবং তাদের মাঝে অনেকদিন ধরে এই যুদ্ধ চলমান থাকে। এমনকি অনেক মানুষ নিহত হয় এবং আব্দুল কায়েস গোত্রের সাধারণ মানুষেরা বকর বিন ওয়ায়েলের কাছে শান্তি প্রস্তাব দেয়। সেই সময় আব্দুল কায়েস বুঝতে পারে যে, এখন বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের বিরুদ্ধে কোন কিছু করার শক্তি তাদের নেই। অতএব, তারা পরাজয় বরণ করে এমনকি তারা হাযরে জুওয়াসা নামক দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে যায়। জুওয়াসা বাহরাইনের সেই বসতি যেখানে মহানবী (সা.)-এর মসজিদের পর সর্বপ্র থম জুমুআ'র নামায আদায় করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, তিনি (রা.) বর্ণনা করেন, ?? ?? ?????? অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-এর মসজিদের পর সর্ব প্রথম জুমুআ বাহরাইনে জুওয়াসা নামক স্থানে আব্দুল কায়েস গোত্রের মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

বনু বকর বিন ওয়ায়েল গোত্র তাদের ইরানী মিত্রদের সাথে নিয়ে অগ্রসর হয়ে তাদের দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে ফেলে এবং দুর্গে রসদপত্র যাওয়া বন্ধ করে দেয়। বনু বকর বিন কিলাবের এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ্ বিন অওফ আবদি, যার নাম আব্দুল্লাহ্ বিন হাযাফ-ও উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি এই পরিস্থিতিতে হযরত আবু বকর (রা.) এবং মদীনাবাসীকে উদ্দেশ্য করে একটি কবিতা শোনান যাতে তিনি নিজেদের অসহায়ত্ব, নিরুপায় অবস্থা আর দৃঢ় মনোবল এবং ধৈর্য্যেরও বহিঃপ্রকাশ করেন। এটি যেহেতু কিছুটা দীর্ঘ কবিতা তাই এর অনুবাদ হলো:

"হে শ্রোতারা! হযরত আবু বকর এবং মদীনার সকল যুবককে এই বাণী পৌঁছে দাও, সে সকল যুবক,জুয়াসাতে ক্ষুধা ও অবরোধের মাঝে যাদের ওপর সন্ধ্যা নেমে এসেছে, তাদের জন্য আপনাদের পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য লাভ হবে কি? সব রাস্তা তাদের রক্তে এমন রঞ্জিত যেন সূর্যের কিরণ দর্শকের চোখকে অন্ধ করে দিচ্ছে। বনু যোহলো আর ইজল আর শায়বান আর কায়েস গোত্রগুলো অন্যায়ভাবে তাদের সবাইকে অবরুদ্ধ করে ফেলেছে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে 'গরুর' যেন অন্যায়ভাবে তারা আমাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে ছিনিয়ে নিতে পারে। গরুরের প্রকৃত নাম ছিল মুনযের বিন নো'মান বিন মুনযের। তাদের অবরোধ কঠোর ও দীর্ঘায়িত হতে হতে একপর্যায়ে তারা আমাদের ওপর বিজয় লাভ করে, আর এ কারণে আমরা পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছি। আমরা রহমান খোদার প্রতি ভরসা করেছি, কেননা আমরা দেখেছি, তাঁর প্রতি ভরসাকারীরা তাঁর কৃপা লাভ করে। তাই আমরা বললাম, আমরা এ নিয়ে সন্তুষ্ট যে, আল্লাহ্ আমাদের প্রভু। আর এ কথায়ও আমরা সন্তুষ্ট যে, ইসলাম আমাদের ধর্ম। আর আমরা বললাম, সমস্যার একদিন সমাধান হয়েই যায়, আমাদের পিতৃপুরুষের সন্তানদের বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। আমরা ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকব; এতে হয় আমরা ধ্বংস হবো, না হয় আমরা শাহাদত বরণ করবো। আমাদের প্রত্যেকে সেই তীক্ষ্ম ধারালো ভারতীয় তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করবে যা নিমিষেই কর্তনকারী আর যা শিরস্ত্রাণ ও বর্মকে কেটে ফেলে।"

আবদি কবিতার আকারে এ বাণী লিখে মদীনায় প্রেরণ করেন।

হযরত আবু বকর (রা.)এই কবিতা পাঠ করে আব্দুল কায়েসের অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হয়ে ভীষণ দুঃখ পান। তিনি হযরত আলা বিন হাযরামী'কে ডেকে পাঠান এবং সৈন্যদলের নেতৃত্ব তার হাতে অর্পণ করেন আর দু'হাজার মুহাজির ও আনসারসহ বাহরাইন অভিমুখে আব্দুল কায়েসের সাহায্যার্থে যাত্রা করার আদেশ দেন আর নির্দেশনা প্রদান করেন যে, আরব গোত্রগুলো থেকে যে গোত্রের পাশ দিয়েই তোমরা অতিক্রম করবে তাদেরকে বনু বকর বিন ওয়ায়েলের সাথে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করবে, কেননা সে ইরানের বাদশাহ্ কিসরার মনোনীত মুনযের বিন নোমান বিন মুনযেরের সাথে এসেছে। সে তথা সেই বাদশাহ্ তার মাথায় রাজকীয় মুকুট পরিধান করিয়েছে আর আল্লাহ্র জ্যোতিকে মিটিয়ে দেয়ার সংকল্প করেছে এবং আল্লাহ্র ওলীদেরকে হত্যা করেছে। তাই তোমরা 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' তথা আল্লাহ্র ইচ্ছা ছাড়া পাপ থেকে রক্ষা লাভের কোনো শক্তি নেই আর পুণ্য করারও শক্তি নেই- দোয়া পড়ে যাত্রা কর।

(কিতাবুর রাদ্দাহ লিল ওয়াকদি, পৃ: ১৫২-১৫৪) (সহী বুখারী, কিতাবুল জুমআহ) (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড,পৃ: ২৮৬)

হযরত আলা বিন হাযরামী যাত্রা করেন। তিনি যখন ইয়ামামার পাশ দিয়ে যান তখন হযরত সুমামা বিন উসাল বিন হানীফা একটি দল নিয়ে তার সাথে যুক্ত হন। হযরত উসামা তাদের সাথে এসে যোগ দেন। এছাড়া কায়েস বিন আসেমও নিজ গোত্র বনু তামীমের সাথে হযরত আলা বিন হাযরামীর সৈন্যদলের সাথে যুক্ত হয়। ইতিপূর্বে কায়েস বিন আসেম যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি প্রদানকারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর তিনি নিজ গোত্রের যাকাত মদীনায় প্রেরণ করা একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অধিকন্তু যাকাতের সংগৃহীত সমস্ত সম্পদ লোকদের ফেরত দিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) যখন ইয়ামামায় বনু হানীফাকে পরাভূত করেন তখন কায়েস বিন আসেম মুসলমানদের সামনে মাথা নত করার মাঝেই নিজেদের নিরাপত্তা নিহিত বলে মনে করেন এবং নিজ গোত্র বনু তামীমের নিকট হতে যাকাত আদায় করেন এবং হযরত আলা বিন হাযরামীর সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ২৩৯, ইসলামি কুতুব খানা, লাহোর)

হযরত আলা নিজ সেনাদল নিয়ে দাহ্নার পথে বাহরাইনের দিকে অগ্রসর হন। দাহ্নাও বসরা থেকে মক্কা অভিমুখে বনু তামীমের এলাকার একটি স্থানের নাম। তিনি বলেন, আমরা যখন এর মধ্যবতী স্থানে উপনীত হই, তখন তিনি আমাদেরকে সেখানে যাত্রা বিরতির নির্দেশ দেন (বর্ণনাকারী বলছেন)। রাতের আঁধারে উটগুলো অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পালিয়ে যায়। তাদের কারো কাছে না কোন উট থাকল, না পাথেয় বা পাথেয় রাখার পাত্র আর না তাঁবু। সবকিছু উটের সাথে মরুভূমিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ, উটের পিঠে চাপানো ছিল, উট যেহেতু পালিয়ে যায় তাই তাদের কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। আর এ ঘটনা তখন ঘটেছে যখন লোকেরা বাহন থেকে অবতরণ করেছিল, কিন্তু তখনও নিজেদের সরঞ্জামাদি নামাতে পারে নি। তখন তাঁরা শোক ও দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়। সকলেই তাদের জীবনের প্রতি নিরাশ হয়ে পরস্পরকে ওসীয়্যত করতে শুরু করে। এরই মধ্যে হযরত আলার আহ্বানকারী সবাইকে একত্রিত হবার ঘোষণা দেয়। সকলেই তার নিকট একত্রিত হয়। হযরত আলা বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে এ কি অস্থিরতা ও ভীতি প্রত্যক্ষ করছি! আর তোমরা এরূপ চিন্তিত কেন? লোকজন বলল, এটি তো এমন কোন বিষয় নয় যার জন্য আমাদেরকে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। আমাদের উটগুলো হারিয়ে গেছে বিধায় আমাদের এরূপ অবস্থা। যদি এভাবেই প্রভাত হয় তাহলে ভালোভাবে সূর্যোদয়ের পূর্বেই আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। হযরত আলা বলেন, হে লোকসকল! ভয় পেয়ো না। তোমরা কি মুসলমান নও! তোমরা কি আল্লাহ্র পথে জিহাদ করতে আস নি? তোমরা কি আল্লাহ্র সাহায্যকারী নও? সবাই বলল, নিঃসন্দেহে আমরা (আল্ল াহ্র সাহায্যকারী)। হযরত আলা (রা.) বলেন, তোমাদের জন্য সুসংবাদ; কেননা আল্লাহ্ তা'লা কখনো এরূপ লোকদেরকে, যে অবস্থায় তোমরা রয়েছ,কখনো পরিত্যাগ করবেন না।

ফজরের সময় ফজরের আযান হয়। হযরত আলা (রা.) নামায পড়ান। কতক ব্যক্তি তায়াম্মুম করে নামায পড়েন, পানি ছিল না, কতকের পূর্বে র ওযুই ছিল। নামায শেষ হবার পর হযরত আলা দোয়া করার জন্য তার দু ই হাঁটুর ওপর ভর করে বসে যান আর অন্যরাও তদ্রুপ নতজানু হয়ে দোয়ার জন্য বসে পড়ে এবং দু'হাত উঠিয়ে আহাজারি করে দোয়ায় রত হয়ে যান। লোকজনও সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত এমনই করে। যখন পূর্ব দিগন্তে সামান্য পরিমাণে সূর্যের কিরণ প্রকাশিত হয় তখন হযর ত আলা সারির প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেন এবং তিনি বলেন, এমন কেউ কি আছে যে গিয়ে সংবাদ নিয়ে আসবেযে, এই আলোর উৎস কী? এক ব্যক্তি সেই কাজের জন্য যায়। সে ফিরে এসে বলে, এই আলো কেবলমাত্র মরীচিকা, যেখানে আলো পড়ছিল সে স্থানটি উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তা পানি ছিল না বরং মরীচিকা ছিল। হযরত আলা পুনরায় দোয়ায় মগ্ন হয়ে যান। পুনরায় সেই আলো দৃষ্টিগোচর হয়। সংবাদ নিয়ে জানা যায় যে, এটি মরীচিকা। তৃতীয়বার পুনরায় আলো দেখাদেয়। এবার সংবাদ প্রদানকারী এসে বলে, এটি পানি। হযরত আলা দাঁড়িয়ে যান এবং অন্যান্য লোকজনও দাঁড়িয়ে যায় আর পানির নিকট পৌঁছে সকলেই পানি পান করেন এবং গোসল করেন। সেখানে কোন ঝরনা নির্গত হয়েছিল। তখনও পূর্ণরূপে

দিনের আলো প্রকাশ পায় নি, লোকজনের উট সকল দিক হতে তাদের নিকট ছুটে আসতে দেখা যায়; তারা তাদের নিকট এসে বসে পড়ে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বাহন হাতে নেয় এবং তাদের কারো কোন সরঞ্জাম হারায় নি।

দোয়ার ফলে এরূপ অলৌকিক ঘটনা সেখানে সংঘটিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা পানিও নির্গত করেছেন, উটও ফেরত এসেছে। লোকজন সেগুলোকেও পানি পান করায়। পুনরায় তারা নিজেরাও তৃপ্তির সাথে পানি পান করে এবং পশুগুলোকেও পান করায় এবং নিজেদের সঙ্গে পানির ভাণ্ডারও নিয়ে নেয় এবং পূর্ণরূপে বিশ্রাম করে।

মিনজাব বিন রাশেদ বলেন, সে সময় হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) আমার সাথে ছিলেন। যখন আমরা সেই স্থান হতে কিছুটা দূরে চলে আসি তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, সেই পানির স্থান সম্পর্কে অবগত আছো? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি এই অঞ্চলের প্রতি ইঞ্চি ভূমিকে অন্য সকল আরবের তুলনায় অধিক জানি। হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বলেন, তাহলে তুমি আমাকে সেই জায়গায় নিয়ে চল। আমি উট ঘুরিয়ে হুবহু সেই ঝরনার স্থানে নিয়ে আসি। সেখানে গিয়ে দেখি যে, সেখানে না কোন জলাধার আছে, না পানির কোন চিহ্ন আছে। আমি হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.)-কে বলি, খোদার কসম! যদিও এখানে কোন চৌবাচ্চা আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না তথাপি আমি এটিই বলব যে, এটিই সেই স্থান যেখান হতে আমি পানি নিয়েছি; কিন্তু আজকের পূর্বে আমি কখনো এখানে পরিষ্কার ও মিষ্টি পানি দেখি নি। অথচ তখনও পানিতে পাত্র পরিপূর্ণ ছিল। হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বলেন, হে আবু সাহাম! খোদার কসম! এটিই সেই স্থান; এজন্যই আমি এখানে এসেছি এবং তোমাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আমি আমার পাত্র পানি দ্বারা পূর্ণ করেছিলাম এবং সেটিকে এই জলাধারের কিনারায় রেখে দিয়েছিলাম। আমি বললাম, যদি এটি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অলৌকিক নিদর্শন ও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ অনুগ্রহ হয়ে থাকে তাহলে আমি এটি বুঝতে পারব আর যদি এটি শুধুমাত্র বৃষ্টির পানি হয়ে থাকে তাহলে সেটিও বুঝতে পারব। দেখার পর বুঝা গেল, নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ্ তা'লার একটি অলৌকিক নিদর্শন ছিল যা তিনি আমাদের রক্ষার্থে প্র কাশ করেছিলেন। এতে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) আল্লাহ্ রপ্রশংসাকীর্তন করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে আমরা যাত্রা অব্যাহত রাখি এবং হাযর-এ এসে যাত্রা বিরতি দিই।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮৬-২৮৮)

হযরত আলা (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে এই মর্মে একটি চিঠি লিখেছিলেন যে, পর সমাচার! আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য দাহ্না উপত্যকায় পানির একটি ঝরনাধারা প্রস্ফু টিত করেছিলেন; এই ঘটনার পর যখন হযরত আবু বকর (রা.)'র নিকট সংবাদ পৌঁছেতখন তিনি এই চিঠি লিখেন; অথচ সেখানে ঝরনার কোন চিহ্নও ছিল না এবং চরম কষ্ট ও দু শ্চিন্তার পর আমাদেরকে তাঁর একটি নিদর্শন দেখিয়েছেন; হযরত আলা হযরত আবু বকর (রা.)-কে চিঠি লিখেন; যা আমাদের সকলের জন্য শিক্ষণীয় এবং এটি এজন্য যে, তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করুন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করুন এবং তাঁর ধর্মের সাহায্যকারীদের জন্য সাহায্য যাচনা করুন। হযরত আলা পানি পাবার পর (অর্থাৎ) এ ঘটনা সংঘটিত হবার পর হযরত আবু বকর (রা.)-কে রিপোর্ট প্রেরণ করছেন।

হযরত আবু বকর (রা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসাকীর্তন করেন, তাঁর নিকট দোয়া করেন এবং বলেন, আরবরা সর্বদা এই দাহ্না উপত্যকা সম্পর্কে একথা বলে আসছে যে, হযরত লুকমানকে যখন এই উপত্যকা (অর্থাৎ, দাহ্না উপত্যকা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, পানির জন্য এটিকে খনন করা উচিত হবে কি না, তখন তিনি তা খনন করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, এখানে কখনো পানি নির্গত হবে না। এ কারণে সে সময় এই উপত্যকায় ঝরনা প্রস্ফু টিত হওয়া আল্লাহ্ তা'লার কুদরত বা শক্তির অনেক বড় একটি নিদর্শন যার বৃত্তান্ত ইতিপূর্বে আমরা কখনো কোন জাতিতে শুনি নি। (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯০)

অতএব এ ধরনের অলৌকিক ঘটনাও সাহাবীদের সাথে সংঘটিত হতো যারা আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে বিভিন্ন অভিযানে বের হতেন। যাহোক, এর বাকি অংশ আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola (Murshidabad)**

সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করাই ধর্মের শিক্ষা

মাহমুদ আহমদ সুমন, ওয়াকেফে জিন্দেগী,

মানুষ আল্লাহতায়ালার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সমগ্র মানুষকে সামাজিকভাবে একতাবদ্ধ করার জন্যই মহান আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবী রসুল পাঠিয়েছেন। মানব জাতি হিসেবে কারো মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই। সকলই এক আল্লাহর সৃষ্টি এবং একই সত্তা থেকে সবার সৃষ্টি। যেভাবে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি একই সত্তা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন আর তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন' (সুরা আন নেসা, আয়াত: ২)। এখানে কোন ধর্ম বা জাতির কথা বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে 'হে মানুষ' অর্থাৎ সমস্ত মানুষের কথা বলা হয়েছে। আবার বলা হয়েছে, তিনি একই প্রাণ থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি তা থেকেই এর জোড়া সৃষ্টি করেছেন'

(সুরা আয যুমার, আয়াত:৭)।

তাই একজন মানুষ সে যে ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন মানুষ হিসেবে সবাই একই সম্প্রদায়ভূক্ত। তাই কাউকে অবজ্ঞা করার কোন সুযোগ নেই। যেভাবে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে 'আর মানবজাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে তারা মতভেদ করল'

(সুরা ইউনুস, আয়াত: ২০)।

আল্লাহতাআলা ইচ্ছা করলে সবাইকে এক ধর্মেরই অনুসারী বানাতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি নিজেই যেহেতু মানুষকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করেছেন তাই আমাদেরকে কোন ধর্মের অনুসারীর প্রতি মন্দ আচরণ করা মোটেও ঠিক নয়। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক যদি চাইতেন অবশ্যই তিনি সব মানুষকে এক উম্মত বানিয়ে দিতেন। কিন্তু তারা সব সময় মতভেদ করতেই থাকবে'

(সুরা হূদ, আয়াত:১১৯)।

তারপর আরো অন্যান্য স্থানে যেমন উল্লেখ রয়েছে, 'আর আল্লাহ চাইলে তিনি তাদেরকে এক উম্মত বানিয়ে দিতেন, কিন্তু তিনি যাকে চান নিজ কৃপার অন্তর্ভূক্ত করেন। আর যালেমদের জন্য কোন বন্ধুও নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই' (সু রা আশ শুরা, আয়াত: ৯)। 'আর আল্লাহ যদি চাইতেন তিনি অবশ্যই তোমাদের সবাইকে একই উম্মতে পরিণত করে দিতেন। কিন্তু যে পথভ্রষ্ট হতে চায় তিনি তাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন এবং যে সঠিক পথ পেতে চায় তিনি তাকে সঠিক পথ দেখান। আর তোমরা যা-ই করতে সে সম্পর্কে তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে'

(সুরা আন নাহল, আয়াত: ৯৪)

'আর আল্লাহ যদি চাইতেন তোমাদের সবাইকে তিনি একই উম্মত করে দিতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। অতএব তোমরা সৎকাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা কর' (সুরা আল মায়েদা, আয়াত: ৪৯)। 'নিশ্চয় তোমাদের এই উম্মত একই উম্মত এবং আমিই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর' (সুরা আল আম্বিয়া, আয়াত: ৯৩)। 'আর জেনে রাখ, তোমাদের এ সম্প্রদায় একটিই সম্প্রদায়। আর আমি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক। অতএব তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর' (সুরা আল মোমেনুন, আয়াত: ৫৩)। পবিত্র কোরআনে উপরোক্ত বিষয়টি বার বার কেন উল্লেখ হয়েছে? নিশ্চয় এর কোন বিশেষ কারণ রয়েছে।

মহান আল্লাহ হলেন সকল জ্ঞানের আধার। তিনি জানতেন যে, এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ একে অপরের ধর্ম নিয়ে মতবিরোধ করবে, সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, এক ধর্মের অনুসারী অন্য ধর্মের লোকদের তুচ্ছ জ্ঞান করবে। তাই আল্লাহ পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি চাইলে এক উম্মতভুক্তই করতেন সকলকে কিন্তু তিনি তা করেননি আমাদের পরীক্ষার জন্য। পবিত্র কোরআন আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, আমরা যেন সকল মানুষের প্রতি দয়াশীল হই। যেহেতু আমাদের সবার সৃষ্টির মূল একটাই। আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাদেরকে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠিতে বিভক্ত করেছেন। আজকে সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায় শুধু অশান্তি আর অশান্তি। এক ধর্মের অনুসারী আরেক ধর্মের অনুসারীকে যেন সহ্যই করতে পারে না। মানবতা বলতে মনে হয় কিছুই অবশিষ্ট নেই। সবাই নিজ নিজ স্বার্থ অর্জনের জন্য ব্যস্ত। একে অপরের প্রতি নেই কোন প্রেম-ভালবাসা। আর এসব হওয়ারই কথা, কেননা আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে আগমণকারী মসীহ্কে মানুষ অস্বীকার করছে। যেহেতু প্রতিশ্রুত মসীহকে অস্বীকার করছে তাই পৃথিবীতে আজ এত অশান্তি।

এরপর ১২ পাতায়

কাবুলের ভূমিতে শান্তি ফিরবে। তা সেই সময় যখন তারা খোদার পক্ষ দিকে প্রত্যাবর্তন করবে আর খোদা তা'লা প্রেরিত পুরুষের আদেশ শিরোধার্য করবে।

একজন আহমদী মুসলমানের অন্যান্য অ-আহমদী গবেষকদের মত অনেক গভীর চিন্তা করা উচিত। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের কাজ এবং গবেষণাকর্মের জন্য খোদা তা'লার কাছেও দোয়া করতে থাকা উচিত। তার এই দোয়া করা উচিত, যে-গবেষণা সে করছে তা যেন এতটা মঙ্গলজনক হয় যা সমগ্র মানবতার কল্যাণ সাধন করবে আর একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে।

২০২১ সালের ২২ শে আগস্ট মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া জার্মানীর ইজতেমার সমাপ্তি অধিবেশনে সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) -এর অনলাইন অংশগ্রহণ।

২০২১ সালের ২২ শে আগস্ট মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া জার্মানীর ছাত্রবৃন্দকে বাৎসরিক ইজতেমার সমাপনী অধিবেশনে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) অনলাইন সাক্ষাত করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) সাক্ষাতের জন্য তাঁর অফিস ইসলামাবাদ (টিলফোর্ড)-এ উপস্থিত ছিলেন। অপরদিকে ১৭০০এর অধিক খুদ্দাম ফ্রাঙ্কফোর্টের এফ.এস.ভি স্টেডিয়াম থেকে অনলাইন সাক্ষাত অনুষ্ঠানে যোগ দান করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর আশিসময় উপস্থিতিতে সাক্ষাতের সময় মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। অথচ অংশগ্রহণকারীরা খোলা আকাশের নীচেই ময়দানে উপস্থিত ছিলেন। হুযুর আনোয়ার উপস্থিতবর্গকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না। সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া জার্মানী উত্তর দেন যে, হুযুর! এখনও পর্যন্ত কোনও সমস্যা হচ্ছে না, বৃষ্টি যেমনই হোক না কেন, আমরা ইনশাআল্লাহ্ বসে থাকব।

এরপর কুরআন করীমের তিলাওয়াত হয়। এরপর খুদ্দাম সদস্যরা হুযুর আনোয়ারকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ পায়।

একজন খাদিম হুযুর আনোয়ারকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কাবুল সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে প্রশ্ন করেন যে, কাবুলের মাটি কি কখনও শান্তি পাবে আর কিভাবে পাবে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কাবুলের ভূমিতে শান্তি ফিরবে। তা সেই সময় যখন তারা খোদার পক্ষ দিকে প্রত্যাবর্তন করবে আর খোদা তা'লা প্রেরিত পুরুষের আদেশ শিরোধার্য করবে। আর তারা যে সব অত্যাচার ও অন্যায় করেছে সেগুলির প্রায়শ্চিত্ত করবে। আর প্রায়শ্চিত্ত হল আল্লাহ্ তা'লা এই যুগে যে ইমামকে প্রেরণ করেছেন, আঁ হযরত (সা.)-এর যে দাসকে তিনি প্রেরণ করেছেন ধর্মের পুনর্জাগরণ ও প্রচারের জন্য, তাঁকে এরা মান্য করবে। তবেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে আর এই শর্ত কাবুলের জন্যও প্রযোজ্য। অন্যথায় এভাবে যুদ্ধবিগ্রহ ঘটতে থাকবে আর আপনারা লক্ষ্য করুন সার্বিকভাবে মুসলমান জাতিরও এই একই দশা। তারা মুখে বলে যে অত্যাচার করবে না। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বর্ণনা করেছেন যে, একজন মোমেন তথা কলেমাপাঠকারীকে হত্যা করা তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। আর এরা কলেমা পাঠকারীদের হত্যা করে চলেছে। এভাবে তো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলী মানতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার আদেশ মান্য করলে তবেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত পুরুষদের বিরোধীতা বন্ধ করলে তবেই শান্তি হবে আর আল্লাহ্ তা'লার এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং দোয়া ও চেষ্টা করাই আমাদের কাজ। আল্লাহ্ তা'লা যেন এদেরকে বিবেক দান করেন আর এরা মান্যকারী হয়। কিম্বা অন্ততপক্ষে নিজেদের আচরণ সংশোধন করে, অন্যায় থেকে বিরত হয় তবে শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ রয়েছে। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লাও অতীব ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা করে দেন।

এরপর এক খাদিম প্রশ্ন করে যে, জার্মানীতে কয়েক মাসের মধ্যে রাজনৈতিক নির্বাচন পর্ব শুরু হচ্ছে যে কারণে এক বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তন হতে চলেছে। কেননা বর্তমানের চান্সেলর পুনর্নির্বাচিত হতে পারবেন না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যেহেতু তিনি অবসর গ্রহণ করছেন তাই পুনরায় আসবেন না। কিন্তু তাঁর দল জয়ী হলে দলের নীতিগুলি তো প্রায় অপরিবর্তিত থাকবে। কিছু কিছু বিষয় থাকে যা চান্সেলর নিজের ইচ্ছে মত করে থাকে। অন্য কোনও দল এলে তাদের নীতিগুলিও অপরিবর্তিত থাকে, তবে ইসলাম পরিপন্থী দলগুলি কিম্বা অতি ডানপন্থী দলগুলি ছাড়া। তারা ক্ষমতায় এলে মুসলমানদের জন্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। কিন্তু আমার মতে যদিও জার্মানীতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বা বিদেশীদের বিরুদ্ধে এক প্রকার মনোভাব পাওয়া যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও দক্ষিণপন্থী দলগুলি জয়ী হবে না। আমার মতে ক্ষমতাসীন দলগুলিই জয়ী হবে।

একজন খাদিম প্রশ্ন করেন যে, একজন আহমদী গবেষককে কোনও মানসিকতা নিয়ে গবেষণা করা উচিত।

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: একজন আহমদী মুসলমানের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করা আবশ্যক। অ-আহমদী এবং আহমদীরাও অনেক পরিশ্রম করে এবং নিজেদের গবেষণার বিষয়ে চিন্তা করে। তারা এক দিক থেকে দুর্বল আর তা হল তারা আল্লাহ্ তা'লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে না। একজন আহমদী মুসলমানের অন্যান্য অ-আহমদী গবেষকদের মত অনেক গভীর চিন্তা করা উচিত। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের কাজ এবং গবেষণাকর্মের জন্য খোদা তা'লার কাছেও দোয়া করতে থাকা উচিত। তার এই দোয়া করা উচিত, যে-গবেষণা সে করছে তার গবেষণা যেন এতটা মঙ্গলজনক হয় যা সমগ্র মানবতার কল্যাণ সাধন করবে আর একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে।

একজন খাদিম প্রশ্ন করেন যে, স্বপ্নে যদি কোনও খলীফাকে দেখা যায় তবে কি এর ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে স্বপ্নটি সত্য?

হুযুর আনোয়ার বলেন: জানি না সত্য স্বপ্ন না কি ভুল স্বপ্ন। কিন্তু নামের ব্যাখ্যা হয়, খলীফাদের নামগুলিও ভাল আর তা পুণ্যময় স্বপ্ন আর যদি পুণ্য নিয়ে কথাবার্তা বলেন তবে তা সত্য স্বপ্নই হবে। এটা তো স্বপ্নের প্রেক্ষাপট দেখেই জানা যেতে পারে। স্বপ্নের আগের এবং পরের অংশগুলি কেমন এবং তাতে কি রয়েছে এই সব দেখে বিভিন্ন স্বপ্নের বিভিন্ন ব্যাখ্যা হয়। কেবল একটি বিষয় দেখা নেওয়াই যথেষ্ট নয়। অনেক স্বপ্নের ব্যাখ্যা হয় নাম অনুসারে। কিছু স্বপ্নের ব্যাখ্যা হয় স্বপ্নে দৃশ্যমান পরিস্থিতি অনুসারে। এখন যদি কেউ বলে সে অমুক খলীফাকে দেখেছে যিনি তাকে বলেছেন নামায পড়া ছেড়ে দাও তবে সেটা তো ঠিক হবে না।

একটি কৌতুক রয়েছে। এক বয়স্ক ব্যক্তির একমাত্র সন্তান বৃদ্ধকালে জন্ম নেয়। সে নামাযে অলস ছিল। তার পিতা অত্যন্ত ধনী ছিলেন, অনেক বড় রাজনৈতিক দলের পরিবারের সদস্য ছিলেন। তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন। ছেলে তাঁর সঙ্গে থাকত। যাইহোক ছেলেকে পড়াশোনা করাতে রাবোয়া নিয়ে আসেন। একদিন ছেলে ঘুম থেকে উঠে বলল, 'আব্বা জি! খলীফা সানি আমাকে স্বপ্নে বলেছেন তুমি নামায পড়ো না। সেই বুজুর্গটি বেশ বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁর খাট দরজার দিকে ছিল আর সামনের দেওয়ালের দিকে ছেলের খাট ছিল। তিনি বললেন, তিনি আমার খাট ডিঙ্গিয়ে তোমার কাছে গেলেন অথচ আমাকে তিনি কিছু বললেন না কেন? তুমি নামায পড়ো না'- একথাটি বলতে তিনি আমার খাট পার করে ওপারে গেলেন তোমার কাছে অথচ জানলাম না। অতএব, এই ধরণের কথাবার্তা এ বিষয়ের উপর নির্ভর করে যে স্বপ্ন নিজের মনগড়া না সত্যি সত্যিই স্বপ্ন।

হুযুর আনোয়ার ইজতেমার শেষে বলেন: সদর সাহেব! সময় শেষ হল। সমস্ত খুদ্দাম মাথায় বৃষ্টি নিয়ে বসে আছে। মাশাআল্লাহ! আমি দেখলাম যে সমস্ত খুদ্দামদের মাঝে ধৈর্য ও উদ্যম রয়েছে। অন্তত এতটুকু শক্তি রয়েছে, এতটুকু তারা বোঝাতে পেরেছে যে তারা বৃষ্টি সহ্য করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের মাঝে আরও বেশি সহনশীলতা ও শক্তি দিন আর তারা সত্যিকার অর্থে ধর্মের সেবক হয়ে উঠুক আর নিজেদের সেই উদ্দেশ্য অর্জনকারী হোক যা খুদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্দেশ্য আর তারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার যে অঙ্গীকার করে, সেই অঙ্গীকার যেন তারা রক্ষাকারী হয়, খিলাফতের রক্ষাকারী হয় এবং নিজেদের যাবতীয় শক্তিবৃত্তি সহকারে এ বিষয়ে চেষ্টা রত হয়। তারা যেন নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞানও বৃদ্ধি ক রে আর ইসলাম আহমদীয়াতের বার্তাও নিজেদের দেশে প্রচারকারী হয়। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন। (আমীন)

সৌজন্যে- আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০ ডিসেম্বর,২০২১

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ভাচুয়াল সাক্ষাত

২০২১ সালের ১৪ শে আগস্ট মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ডেনমার্কের সদস্যরা ভার্চুয়াল সাক্ষাতে হুযুরর আনোয়ার (আই.)-এর কল্যাণময় সান্নিধ্য লাভ করেন। অনুষ্ঠানে তারা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছিলেন যার মধ্য থেকে নির্বাচিত অংশ উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: আমি গত ছয় বছর ধরে ডেনমার্কে বাস করছি। এখানকার সমাজ ব্যবস্থা পাকিস্তান থেকেই পুরোপুরি আলাদা। আমরা কিভাবে আমাদের সন্তানকে ডেনিশ সমাজে একীভূত করে সঠিক তরবিয়ত দিতে পারি?

হুযুরর আনোয়ার এর উত্তরে বলেন: আশ্চর্যের বিষয়! ছয় বছরে আপনি এটা বুঝতে পারেন নি! আমি গত ছয় বছরে এই বিষয়ে অনেক কথা বলেছি। সেগুলো আপনি শুনেছেন?

প্রশ্নকর্তা: জ্বী হুজুর, আমি শোনার চেষ্টা করেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সমাজের সাথে কিভাবে একীভূত হতে হবে- সে বিষয়ে আমি অনেকবার বলেছি। পিতামাতাদের বলেছি যে সন্তানদের সাথে বন্ধুত্ব করুন যাতে সে বাইরে গিয়ে যা কিছু শেখে, যা কিছু আলোচনা করে, যা কিছু তাকে এখানে স্কুলে শেখানো হয়, এখানে স্কুলে যেভাবে একদম খোলাখুলি শিক্ষকরা শেখায়, সেই সব কথাগুলি যেন আপনার সন্তান আপনার সঙ্গে ভাগ করে নেয়। এজন্য আপনাকে সন্তানের সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে। যখন সে আপনার সাথে কোন কথা বলবে, তখন অবশ্যই লজ্জা না পেয়ে তাকে উত্তর দিবেন। এমন কিছু প্রশ্ন থাকবে যার উত্তর দিতে পাকিস্তানের সমাজ অনুযায়ী আপনার সংকোচ হতে পারে। এসব বিষয়ে তাকে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর দিবেন। কিছু এমন বিষয় আছে যার সম্পর্কে সন্তানদের বলতে হবে যে, তোমাদের হয়তো এই বিষয়ে স্কুলে বলা হয়েছে। কিন্তু এই কথাগুলো শোনার মত বয়স তোমাদের হয় নি। যখন তোমরা বড় হবে তখন তোমরা এই বিষয়ে জানতে পারবে। তাদের কখনও বলবেন না যে, তোমরা ভুল করেছ। তাদের বলুন, শিক্ষক তোমাদের বলছে এতে সমস্যঅ নেই।কিন্তু যখন তোমরা বড় হবে তখন নিজেরাই এই বিষয়ে জানতে পারবে। যখন তোমরা নির্দিষ্ট বয়সে উপনীত হবে তখন তোমরা এর উত্তর পেয়ে যাবে। তাই তাদের মাঝে এই অভ্যাস সৃষ্টি করুন, যেন সে সব বিষয় আপনাকে বলে। আপনাদের মাঝে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, তাদেরকে উত্তম গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করুন। তাদের চরিত্রের উপর বিরূপ প্রভাব রাখে এবং ধর্মীয় শিক্ষার পরিপন্থী এমন বিষয়গুলো তাদেরকে বোঝান। তাদের মন-মস্তিষ্কে একথা গেঁথে দিন যে তারা আহমদী। তাদের বোঝাতে হবে যে আহমদীয়াত কী? আহমদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম। তাদের বলুন, আমরা আহমদী; আমাদের উদ্দেশ্য এবং করণীয় সম্পর্কে তাদেরকে বলুন। তাদের জাগতিক মানুষের বিষয়ে বলুন যে, তারা শুধুমাত্র জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য আর কামনা-বাসনার পিছনে ছুটছে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য অনেক মহান। অতএব, তোমরা সেই উদ্দেশ্য লাভ করতে শৈশব থেকেই চেষ্টা কর। বাকি আনুষঙ্গিক বিষয় এবং জাগতিক বিষয়ে পরবর্তীতে তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে। এভাবে ভাবের আদানপ্রদান হলে ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে যার কারণে তারা আপনাদের সব কথা বলবে। কিন্তু তারা যদি ভাবে যে, আমাদের বাবা-মা আমাদের কথা শুনবে না, আমাদের কোনও প্রশ্নের উত্তর দিবে না, তারা আমাদের প্রতি রাগ করবে, চুপ করিয়ে দিবে- তখন সমস্যা সৃষ্টি হবে।

প্রশ্ন: বৈশ্বিক সরকার ব্যবস্থাপনায় পবিত্র কুরআন পোড়ানোর মত অপরাধ দমনে সীমিত পরিসরে ব্লাসফেমী আইন কি রাখা উচিত?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এটা ব্লাসফেমী আইন রাখা বা না রাখার প্রশ্ন নয়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পবিত্র বস্তুর, নবীদের এবং ঐশী কিতাবের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। মানুষের তৈরী কোনও আইন তা পরিবর্তন করতে পারবে না। মূল বিষয় হল, তাদের বলতে হবে যে,তোমরাই বল, অন্যের আবেগ অনুভুতির প্রতি শ্রদ্ধা থাকা উচিত। সর্বস্তরে তোমরা মানুষের আবেগের সুরক্ষার জন্য আইন পাস করেছ। আবার তোমরাই বলে থাক যে, এটি মত প্রকাশের স্বাধীনতা। প্রত্যেকের নিজের স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। আর যদি এটি স্বাধীনতা হয়ে থাকে, তাহলে কারো মতামত যখন অন্যকে আঘাত করে তখন মতামত প্রকাশের সীমারেখা থাকা উচিত। স্বাধীনতার অর্থ এটি নয় যে, তোমরা মানুষের পকেট মারবে অথবা ছিনতাই করে বেড়াবে। স্বাধীনতার মানে এই নয় যে, তোমরা কারো বাড়িতে চড়াও হয়ে জিনিসপত্র চুরি করবে। এটি কখনও স্বাধীনতা হতে পারে না। এমন করলে আইন শাস্তি দেয় না? একইভাবে তোমরা যে শাস্তিই নির্ধারণ কর না কেন, সেটা হোক ব্লাসফেমী বা অন্য কিছু; কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কমপক্ষে এই আইন পাস কর যে, একজন নাগরিককে অব্যশই অন্যের আবেগ অনুভূতির সম্মান করতে হবে। আর যে সমাজে পারস্পরিক আবেগ অনুভূতির সম্মান করা হয়, সেখানে আপনাআপনি একটি স্থায়ী শান্তির পরিবেশ তৈরী হবে। আর যখন শান্তি ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন কেউ অন্যের আবেগ অনুভূতি নিয়ে হাসি-তামাশা করবে না। এটাই মূল বিষয় যা পৃথিবী বাসীকে বোঝাতে হবে। এছাড়া ব্লাসফেমীর জন্য আল্লাহ্ তা'লা কোন শাস্তি নির্ধারণ করেন নি। কিন্তু আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা ভাই ভাই হয়ে থাক। একটু আগেই আপনারা কুরআন করীমের আয়াত তিলায়াত শুনেছেন- 'তোমরা পারস্পরিক আবেগ-অনুভূতির সম্মান কর।' যদি এই আইন আমাদের সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে যে, শুধু মাত্র অধিকার আদায় নয় বরং অন্যদের অধিকার প্রদান করাও আমাদের কাজ। যদি এই বিষয়টি সকল নাগরিক অনুধাবন করে, তবে এটিই আমাদের ধর্ম শিক্ষা দিবে। দুই বছর আগে ২০১৯ সালের জলসায় আমি অনেক অধিকারের কথা বলেছি। এবছরও কিছু অধিকারের কথা বলেছি। যদি একজন এসকল অধিকারের প্রতি মনোযোগ দেয় তাহলে সমস্যা সৃষ্টির হওয়ার সুযোগ নেই। তখন ব্লাসফেমী আইন প্রয়োগের প্রশ্নই ওঠে না। অন্য কোন আইন থাকারও দরকার নেই। মূল বিষয় হল, পারস্পরিক আবেগ-অনুভূতির সম্মান করা। এই বিষয়টি আমাদের অনুধাবন করা উচিত এবং নিজ নিজ জীবনে বাস্তবায়বন করা হলে সকল সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে এবং প্রেমপ্রীতি এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যখন এমন পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে তখন মানুষ একে অন্যের আবেগ নিয়ে খেলবে না , হোক সেটি ধর্মীয় আবেগ বা ব্যক্তিগত অনুভূতি।

প্রশ্ন: কখনও যদি এমন সময় আসে যখন দাজ্জালী শক্তি আহমদী জামাতের সাথে যুদ্ধ করবে। আর যদি এমন হয় তাহলে আহমদীদেরও কি যুদ্ধ করতে হবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: বিষয় হল, যখনই কোন সরকার বা জাতি ধর্মকে নির্মূল করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করবে তখন আহমদীদের যুদ্ধ করা বা জিহাদ করার অনুমতি রয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: ঈসা মসীহ (আ.) যুদ্ধ রহিত করবেন। ইলতিওয়া'-র অর্থ হল প্রলম্বিত করা, কিছু সময়ের জন্য রহিত করা। ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ রাখা যতক্ষণ পর্যন্ত সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। এখন ধর্মের বিনাশের জন অস্ত্রের ব্যবহারের মত পরিস্থিতি নেই। যখন ধর্মের বিনাশের জন্য অস্ত্র প্রয়োগ করা হবে তখন মুসলমানদের জিহাদ করার অনুমতি রয়েছে। আর তখন আহমদীদের সব চেয়ে অগ্রগামী হতে হবে। কিন্তু এটি ধর্মের খাতিরে। কিন্তু বর্তমানে যে সব যুদ্ধ করা হচ্ছে সেগুলো সব ভু-রাজনৈতিক যুদ্ধ। আর তাতে স্বয়ং মুসলমানরা অন্যদের ধর্মগ্রহণ করছে। মুসলমানরাই অমুসলিমদের হত্যা করছে, তা-ও অন্যদের সহায়তায়। জিহাদ কীভাবে হল? আজকের জিহাদকে কি জিহাদ বলা যায়?

অতএব, এই যুগ কলমের জিহাদের যুগ। যেভাবে মসীহ মওউদ (আ.) -এর আগমণের ব্যাপারে বুখারী শরীফে লেখা আছে ইয়াযাউল হারব অর্থাৎ যুদ্ধ রহিত হবে। কেননা দাজ্জালী শক্তি এবং ধর্মীয় নেতারা সাহিত্য, লেখনী এবং মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলবে। আর এর জবাবে এসব মাধ্যমই আমাদের ব্যবহার করতে হবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কখনও বলেন নি যে, জিহাদের চিরাবসান হল। তিনি বলেছেন, যারা একথা শোনার পরও যুদ্ধ করবে তারা অবিশ্বাসীদের কাছে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হবে। যে কাফির তোমার ধর্মের বিপক্ষে যুদ্ধ না করবে, তাদের বিরুদ্ধে যদি তোমরা জাগতিক স্বার্থের জন্য যুদ্ধ কর তাহলে তোমরা অবশ্যই পরাজিত হবে। আর দেখুন, এখন ঠিকই মুসলমানরা মার খাচ্ছে। মসীহ মওউদ (আ.) -এর কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বলেছেন,ঈসা মসীহ (আ.) যুদ্ধ রহিত করবেন। আর সেই পরিস্থিতি সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত তিনি সত্য সত্য ধর্মযুদ্ধকে রহিত করেছেন। দোয়া করুন সেই অবস্থা যেন সৃষ্টি না হয়। আর যদি সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় তাহলে আহমদীদের যুদ্ধ করার অনুমতি রয়েছে। কেননা শত্রুরা ধর্মকে নির্মূল করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ্ তা'লা মহনবী (সা.) কে যুদ্ধ করার যে অনুমতি দিয়েছেন তা প্রথমবারের মত সূরা হজ্জে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে,তোমাদের যুদ্ধের অনুমতি এজন্য দেওয়া হয়েছে কেননা তারা এখন সীমালঙ্ঘন করেছে, তারা ধর্ম বিনাশ করার চেষ্টা করছে। এখন যদি তাদের প্রতিহত না করা হয় তাহলে কোনও সীনাগগ, চার্চ,মন্দি বা মসজিদ রক্ষা পাবে না।

২০১৩ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

মসজিদ বায়তুল আফিয়াত-এর শুভ উদ্বোধন

আজ প্রোগ্রাম অনুযায়ী ওয়ালডশাট টিনজেন শহরে মসজিদ বায়তুল আফিয়াতের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল। হুযুর আনোয়ার দশটা ৪০ মিনিটে বিশ্রামক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে ইজতেমায়ী দোয়া করান। এরপর হুযুরের সফরদলটি রওনা দেয়। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ওয়াল্ড শাট শহরের দূরত্ব ৩৭০ কিলোমিটার। প্রায় ৪ ঘন্টা ২০ মিনিট সফরের পর হুযুর আনোয়ার বাচার্রে আসেন। পূর্বনির্ধারিত অনুষ্ঠান অনুযায়ী মসজিদে উদ্বোধনের কারণে এখানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সওয়া চারটের সময় হুযুর বায়তুল আফিয়াতের জন্য রওনা হন। পাঁচ মিনিটের সফর করে তিনি মসজিদ বায়তুল আফিয়াতে পৌঁছে যান।

স্থানীয় জামাতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হুযুরের আগমণের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে নিজেদের প্রস্তুতিতে মগ্ন ছিল। হুযুর আনোয়ার এই প্রথম তাদের শহরে পদার্পণ করতে চলেছেন। তাদের জন্য আজকের দিনটি অত্যন্ত আনন্দের। প্রত্যেকেই উৎফুল্ল বদনে পুলকিত নয়নে হুযুরের পথ চেয়ে ছিল। আজ আশেপাশের জামাতের মানুষও সমবেত হয়েছে। হুযুর আনোয়ার গাড়ি থেকে নেমে আসা মাত্রই জামাতের সদস্যগণ পরম উদ্দীপ্ত কণ্ঠে নিজেদের প্রিয় ইমামকে অভিবাদন ও উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে থাকল। কচিকাচাদের বিভিন্ন গ্রুপ আগমণী গীত উপস্থাপন করল। ছোট বড় প্রত্যেকে হাত নাড়িয়ে হুযুরকে স্বাগত জানাচ্ছিলেন। মহিলারাও নিজেদের প্রিয় ইমামকে চাক্ষুস দর্শন করে ধন্য হচ্ছিল। একজন তিফল (বালক) মামুন আখতার হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে ফুলের তোড়া উপস্থাপন করে।

সদর জামাত ইমরান বাশারত সাহেব, রিজিওনাল আমীর নাসীর বার্মী সাহেব এবং এই অঞ্চলের মুবাল্লিগ সিলসিলা শাকীল আহমদ সাহেব উমর হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে স্বাগত জানান এবং করমর্দন করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) মসজিদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট হলঘরের দিকে আসেন এবং যোহর ও আসরের নামায পড়ান। এরপর মসজিদের উদ্বোধন সম্পন্ন হয়। নামাযের পর হুযুর আনোয়ার কিছুক্ষণের জন্য মসজিদে উপবিষ্ট থাকেন। সেই সময় স্থানীয় জামাতের সকল সদস্য হুযুরের সঙ্গে করমর্দন করেন। হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে সদর জামাত বলেন, এই জামাতের জনসংখ্যা ১২১ জন। আজকে মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আশেপাশের জামাত থেকেও মানুষ এসেছেন। সুইজারল্যান্ডের সীমা এখান থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে। সুইজার ল্যান্ড থেকে আমীর সাহেব এবং অন্যান্য কিছু সদস্য মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসেছিলেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) মহিলাদের হলঘরে আসেন। বালিকাদের গ্রুপ দোয়া সংবলিত নযম উপস্থাপন করে। মহিলারা হুযুরের যিয়ারত করেন। হুযুর বাচ্চাদেরকে স্নেহভরে চকলেট উপহার দেন। এরপর হুযুর আনোয়ার মসজিদের বাইরের অংশে এসে একটি চারাবৃক্ষ রোপন করেন। প্রাদেশিক টিভি চ্যানেল এস.ডবলিউ.আর ফ্রেইবার্গ এর এক মহিলা সাংবাদিক মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন। ভদ্রমহিলা হুযুরের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন।

* সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, এটি একটি ছোট শহর, এখানে আপনার মসজিদ নির্মাণের পেছনে উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন- ইবাদত করার জন্য আহমদীদের এখানে একটি জায়গার প্রয়োজন ছিল, যেরূপ ইহুদীদের 'সাইনাগগ' হয়ে থাকে। খৃষ্টানদের গির্জাঘর হয়ে থাকে। প্রত্যেক ধর্মের নিজের নিজের উপাসনাগার থাকে। আমাদের ইবাদতের জন্য একটি মসজিদের প্রয়োজন ছিল যাতে আমরা একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে পারি এবং মানবতার সেবা করতে পারি।

*সাংবাদিক দ্বিতীয় প্রশ্ন করেন যে, আপনি কি এখানে পারস্পরিক শান্তির বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং শান্তির প্রসার ঘটাবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: আমাদের বার্তাই হল শান্তি ও ভালবাসার। আর এটিই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা। আমাদের প্রচেষ্টা হল ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং পৃথিবীবাসীর সামনে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ তুলে ধরা। এই কাজটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এরপর স্থানীয় মজলিসে আমলা এবং জামাতের পদাধিকারীগণ হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে গ্রুপ ফটো তোলেন। এরপর বেলা পাঁচটার সময় হুযুর আনোয়ার হোটেলে ফিরে যান। মসজিদ সংলগ্ন একটি উন্মুক্ত জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে মসজিদ বায়তুল আফিয়াতের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ৬টা ১৫ মিনিটে হুযুর আনোয়ার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। তিলাওয়াত করেন মাননীয় শাকীল আহমদ সাহেব, মুবাল্লিগ সিলসিলা। এবং তিলায়াতকৃত অংশের জার্মান অনুবাদ উপস্থাপন করেন।

* এরপর আব্দুল্লাহ ওয়াগাস হাউযার সাহেব, আমীর জামাত জার্মানী, পরিচিতি জ্ঞাপন মূলক বক্তব্য রাখেন। আমীর সাহেব অতিথি বর্গকে স্বাগত জানিয়ে এই শহরের পরিচিতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন এখানকার কাউন্টি ওয়াল্ডশাট টিনজেন-এর জনসংখ্যা এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার। এবং এই ওয়াল্ডশাট শহরের জনসংখ্যা হল ২৪ হাজার। এই শহর জার্মানীর প্রাচীনতম শহরগুলির মধ্যে একটি। ১২৫৬ সালে এই শহরের গোড়াপত্তনের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। এই শহরের একটি অংশ জার্মানীল বিখ্যাত জঙ্গল 5cWARZWALD এ অর্থাৎ ব্ল্যাক ফরেস্টে এবং অপর প্রান্তটি সুইজারল্যান্ডের সীমানায় গিয়ে মিলেছে। ওয়াল্ডশাট শহর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৪৬ মিটার উচ্চতায় অবস্থান করছে। এই শহরে ১৯৮৫ সাল থেকে আহমদীদের বসতি স্থাপন আরম্ভ হয় এবং ১৯৮৬ সালে রীতিমত জামাত অস্তিত্ব লাভ করে। জামাত এখানে খিদমতের কাজে অগ্রণী থাকে। প্রত্যেক বছর বছরের শুরুতে জামাত শহরটিকে পরিস্কার করে। মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে আমীর সাহেব বলেন- শহরের ব্যবস্থাপনা আমাদেরকে স্বাগত জানিয়েছে। নির্মাণকালে স্থানীয় প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ অত্যন্ত উদরতার পরিচয় দিয়ে জামাতকে নিজেদের জায়গায় জুমার নামায ও ঈদের নামায পড়ার ব্যবস্থা করে দেয়। মসজিদ বায়তুল আফিয়াত যেখানে নির্মিত হয়েছে সেই জায়গায় পূর্বে একটি মার্কেট ছিল। জমিটির আয়তন ১৮৮ বর্গমিটার যা এক লক্ষ ১৮ হাজার ইউরোর বিনিময়ে ক্রয় করা হয়েছে। ২৩ শে মার্চ ২০১৬ সালে মসজিদ নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এবং ২০১৭ সালের ১০ ই এপ্রিল নির্মাণ সম্পন্ন হয়। মসজিদের দুটি হলঘর রয়েছে। যেগুলির আয়তন ১০১.৭ বর্গমিটার। মিনারের উচ্চতা ৭ মিটার। মহিলা ও পুরুষদের জন্য দুটি পৃথক পৃথক হলঘর ছাড়াও একটি অফিস বানানো হয়েছে এবং একটি রান্নাঘরও তৈরী করা হয়েছে।

* আমীর সাহেবের বক্তব্যের পর লর্ড মেয়রের প্রতিনিধি সিলভিয়া ডোবল সাহেবা নিজের বক্তব্য রাখেন। তিনি সিটি কাউন্সিলের মেম্বার এবং সোশাল পার্টি এস.ডি.পি-রও মেম্বার। তিনি বলেন: মহাসম্মানীয় খলীফাতুল মসীহ! আমি সর্ব প্রথম খলীফাতুল মসীহকে স্বাগত জানাই এবং লর্ড মেয়রের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এই কারণে যে, তিনি অন্য একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে গেছেন। যে জন্য তিনি এখানে আসতে পারেন নি। আমি নতুন মসজিদ নির্মাণের জন্য আপনাদের সাধুবাদ জানাই। এই মসজিদটি অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। বাহ্যিকভাবে চিন্তাভাবনা করার জন্য এবং আত্মপর্যালোচনা করার জন্য এই ভবনটি অত্যন্ত উপযুক্ত মনে হচ্ছে। আমি শহরের মানুষদের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এই জন্য যে, আপনি আমাদের জন্য মসজিদ দেখার সুযোগ আপনাদের রীতি রেওয়াজ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার সুযোগ তৈরী করে দিয়েছেন। আমি মনে করি এই মসজিদরূপে আপনি আমাদের শহরকে একটি হীরকখণ্ড উপহার দিয়েছেন। মসজিদ নির্মাণ হওয়ার পূর্বে যারা এই ভবনটির দশা দেখেছিল তারা এখন নিশ্চয় আনন্দিত হবে যে, এই ভবনটিকে একটি সুন্দর মসজিদের রূপ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আমি এই জন্য জামাতকে ধন্যবাদ জানাই যে, আপনারা আমাদের জন্য নিজেদের দরজা খোলা রেখেছেন এবং আপনাদের শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। কেননা এখানে একাধিক ধর্ম আছে, এবং একে অপরকে খোলাখুলিভাবে নিজেদের ধর্মের শিক্ষা সম্পর্কে বলা আবশ্যক। আমি এবিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি যে, সমস্ত ধর্মের মানুষ যেন পরস্পর শান্তি ও সৌহার্দপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে। আমার বাসনা জামাত আহমদীয়া যেন উন্নতি লাভ করে। যেভাবে আপনারা সহযোগিতা করেছেন এবং সুসম্পর্ক রেখেছেন ভবিষ্যতেও এমন সহযোগিতা ও সুসম্পর্ক থাকবে। মসজিদের উপর লিখিত আপনাদের কলেমা সম্পর্কে শহরের মানুষের মনে কিছু ভীতি ও সংশয় ছিল। আপনাকে ধন্যবাদ এই জন্য যে, আপনি নিজেই সে সংশয় দূর করেছেন এবং আপনি বলেছেন যে এই পৃথিবীর স্রষ্টা একজনই । যিনি সকলের স্রষ্টা। আমি ক্ষমাপ্রার্থী যে আমার মনে এমন ভীতি ও সংশয় তৈরী হয়েছিল। পরিশেষে ভদ্রমহিলা বলেন, আমার বাসনা আপনাদের মসজিদ সব সময় আবাদ থাকুক এবং এখানে যেন অনেক মানুষ আসে। (ক্রমশঃ.....)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 28 July, 2022 Issue No. 30

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আমরা কি পারি না সবাই মিলে ঐকবদ্ধ হয়ে এক খলীফার নেতৃত্বে চলতে? এক সাথে দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে? দেশকে মায়ের মত ভালোবাসতে? আমরা কি পারি না ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার এই কথাকে গ্রহণ করে নিতে? দেশের সম্পদকে নিজের সম্পদ মনে করতে? কেন পারবো না, অবশ্যই চেষ্টা করলে আমরা পারব। দেশ প্রেম যদি আমাদের মাঝে না থাকে তাহলে কোন কিছুই করা সম্ভব নয়। শান্তিময় পৃথিবীকে যদি আবার শান্তিতে পরিপূর্ণ করতে চাই তাহলে সকল ধর্মের লোকদেরকে আহমদীয়া খলীফার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে হবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করে সবাইকে একে অপরের সাহায্যের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তাহলেই না আমরা একই খোদার একই উম্মত বলে খোদার কাছে বিশেষ মর্যাদা লাভ করব। আমরা যদি আমাদের দোষ-ত্রুটিগুলোকে সংশোধনের চেষ্টা না করি তাহলে এমনও হতে পারে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংসও করে দিতে পারেন। আর যদি আমরা সংশোধনের চেষ্টা করতে থাকি তাহলে তিনিই আমাদের সাহায্য করবেন। যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক কোন জনপদকে অন্যায়ভাবে কখনো ধ্বংস করেন না যখন এর অধিবাসীরা সংশোধনের কাজে রত থাকে'

(সু রা হূদ, আয়াত: ১১৮)।

মহান আল্লাহতায়ালা মানুষকে সৃষ্টির পর দু'টি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। একটি হল ভাল আর অপরটি হল মন্দ। যে ভাল কাজ করবে সে তার প্রতিদান পাবে আর যে মন্দ কাজ করবে সেও তার প্রতিদান পাবে। তিনি ইচ্ছে করলে সবাইকে মোমেন বানাতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। যেভাবে বলা হয়েছে, 'আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক যদি চাইতেন তাহলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই অবশ্যই এক সাথে ঈমান নিয়ে আসতো। তুমি কি তবে বল প্রয়োগে লোকদেরকে মুমিন হতে বাধ্য করতে পার?'

(সুরা ইউনুস, আয়াত: ১০০)।

আল্লাহতায়ালা ধর্মের ব্যাপারে কারো ওপর কোন ধরণের বল প্রয়োগের অনুমতি দেন নি। এ ব্যাপারে সবার স্বাধীনতা রয়েছে। আমরা যদি পবিত্র কোরআনের শিক্ষার ওপর আমল করি তাহলে কিন্তু আমাদের সমাজে কোন ধরণের অরাজকতা থাকতে পারে না। আমরা জানি, আল্লাহতায়ালার সকল নবী-রাসুলগণই সমাজে ভ্রাতৃত্ব গঠনের জন্য দিন রাত পরিশ্রম করেছেন। যেহেতু সব নবী-রসুল একই ঐশী উৎস থেকে এসেছিলেন এবং তাদের শিক্ষাসমুহ কমবেশি একইরূপ ছিল। এছাড়া তাদের আবির্ভাবের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও ছিল এক ও অভিন্ন-পৃথিবীতে আল্লাহর তৌহিদ এবং মানবের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা। দেখা যায় সকল ধর্মের একই মূলনীতি আর তা হল আল্লাহর তৌহিদের প্রচার। তাই আসুন, আমরা সবাই সবাইকে ভালবাসি এবং সকল ধর্মের অনুসারীকে ভালবাসি আর একে অপরের সুখ-দু:খের সঙ্গী হই। আমরা যদি এমনটি করি তবেই না আমরা একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ ও দেশ গড়তে পারব।

****

১ম পাতার শেষাংশ.....

সূরার বিষয়বস্তুর এই আয়াতটির সম্পর্ক হল এতে ঐশী ইলহামের প্রয়োজনীয়তার আও একটি প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। মানুষ যখন ভূমিষ্ঠ হয়,তখন কোনও কিছুই তার জানা থাকে না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাকে চোখ, কান এবং হৃদয় সহকারে সৃষ্টি করেন যাতে সে এগুলির সাহায্যে শিখতে পারে। কাজেই গতানুগতিক যে শিক্ষা মানুষ লাভ করে সেগুলি সবই খোদা প্রদত্ত উপকরণের মাধ্যমেই শেখা হয়। কোনও মানুষ একথা বলতে পারবে না যে, খোদা-প্রদত্ত উপকরণগুলির প্রয়োজন তার নেই আর সে নিজে থেকেই জ্ঞানার্জনের উপকরণ সৃষ্টি করতে পারবে। তবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের জন্য খোদা তা'লা যে সব উপায় উপকরণ সৃষ্টি করেন সেগুলির ব্যবহার করতে অস্বীকার করা হয় কেন?

আশ্চর্যের বিষয় হল মানুষের সকল শ্রেষ্ঠত্ব সেই উপকরণ ব্যবহারের মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে যা তাকে প্রকৃতি দান করে থাকে। মানুষ যে সমস্ত উৎকর্ষ অর্জন করতে পেরেছে তা সবই এই সব শক্তিবৃত্তির সাহায্যে। আর এই শক্তিবৃত্তিগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সে কোনও সংকোচ করে না। কিন্তু যখন আধ্যাত্মিক উপায় উপকরণের প্রশ্ন আসে,তখন সে বলে, 'আমার এসবের প্রয়োজন কি? আমি নিজেই নিজের কাজ করতে পারি। অথচ যেভাবে তার জাগতিক উন্নতির জন্য খোদা প্রদত্ত উপকরণের প্রয়োজন রয়েছে অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক ঔৎকর্ষ অর্জনের জন্য সেই সব উপকরণের প্রয়োজন যা আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় পূর্ণ প্রজ্ঞা দ্বারা তার জন্য সৃষ্টি করেন।

আয়াতের শেষে তিনি বলেছেন, এই সব বস্তু দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল তোমাদের মধ্যে যেন আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির মূল্যায়ন হয়। এর বিপরীতে তোমরা এই সব শক্তিগুলি নিয়ে গর্বিত হয়ে পড় আর দাবি কর যে তোমাদের কোনও বাহ্যিক সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

এই আয়াতে কানের পর চোখ এবং চোখের পর হৃদয়ের উল্লেখ করা হয়েছে আর ক্রমানুসারে এই অঙ্গগুলিই মানুষের জ্ঞানার্জনের কারণ হয়। শিশুর কানদুটিই সর্ব প্রথম কাজ করে। তার পর চোখ এবং এই দুটির পর অন্তর বা চিন্তাশক্তি কাজ করে। আজ চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, সর্বপ্রথম শিশুর কান কাজ করা শুরু করে এবং এরপর চোখ কাজ করে করতে শুরু করে এবং সব শেষে চিন্তা শক্তি কাজ করতে শুরু করে। তাই দেখা যায় জীবজন্তুদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে কয়েকদিন পর তাদের বাচ্চাদের চোখ ফোটে। এই সময় শুধু তাদের কান কাজ করে। মানব শিশুর চোখ বাহ্যত ফুটে গেছে বলে হলেও সেগুলি কাজ করতে শুরু করে কান করতে শুরু করার পরেই। আর চিন্তাশক্তি অনেক পরে কাজ করতে শুরু করে। এই পর্যায়ক্রমটিও প্রমাণ করে যে কুরআন করীম ঐশী বাণী। কেননা, এতে সেই রহস্য বর্ণিত হয়েছে যা সেই যুগে লুক্কায়িত ছিল।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ২০৮)

সমাজের রীতি-নীতি ও কুপ্রথার বোঝা নিজেদের উপর চাপতে দিবেন না।

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন:

সমাজের রীতি-নীতি ও কুপ্রথার বোঝা নিজেদের উপর চাপতে দিবেন না। আঁ হযরত (সা.) আমাদেরকে মুক্তি দিতে এসেছিলেন। আমরা সেই সব বিষয় থেকে মুক্তি পেয়েছি আর এই যুগের ইমাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সেই অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করেছি। যেমনটি বয়আতের ষষ্ঠ শর্তে উল্লেখ রয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লিখেছেন- কুপ্রথার অনুসরণ এবং রিপুর দাসত্ব থেকে বিরত থাকবে। অর্থাৎ চেষ্টা করতে হবে কুপ্রথা থেকে বিরত থাকার এবং রিপুর কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকার। অতএব, অল্পে তুষ্ট এবং কৃতজ্ঞ থাকার উপর গুরুত্ব দিন। এই শর্তটি ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক আহমদীর জন্য। প্রত্যেক আহমদীকে নিজের সাধ্যানুসারে এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। " (খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৫ শে নভেম্বর, ২০০৫)

(রিশতা নাতা বিভাগ, নাযারাত ইসলাহ ও ইরশাদ, কাদিয়ান)

আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ান (আ.) বলেন-

" আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামাল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানি। আমরা ফিরিশতা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্ ও রসুল (সা) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দিই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না, এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশী করি না। যা কিছু রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি-আমরা এর হিকমত বুঝি না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি- আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।" (নুরুল হক' খণ্ড-১, পৃ: ৫)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir